প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Bureau of The University Grants Commission

পরিচিতি

বিষয় : ভূগোল **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায় : EGR 11 : 01-02

	রচনা	সম্পাদনা
একক - 1	অধ্যাপক সুধীর মালাকার	অধ্যাপিকা (ড.) কানন চ্যাটার্জী
একক - 2	ঐ	ঐ
একক - 3	ঐ	ঐ
একক - 4	ঐ	ঐ

	রচনা	সম্পাদনা
একক - 1	অধ্যাপিকা চন্দনা চ্যাটার্জী	অধ্যাপিকা (ড.) কানন চ্যাটার্জী
একক - 2	ঐ	ঐ
একক - 3	ঐ	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

E G R - 11
ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশ
(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
1

একক 1	ভূগোল : সংজ্ঞা, মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক, আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ, অবস্থান	8-18
একক 2	ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশ	19-25
একক 3	ভৌগোলিক চিন্তাধারা	26-36
একক 4	আঞ্চলিক মতধারা	37-46

পর্যায়
2

একক 1	সংস্কৃতির উৎস, বিকাশ এবং তার বিকেন্দ্রীকরণ	48-55
একক 2	বিশ্বে পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির নমুনা	56-63
একক 3	স্থান বা পরিসরের ধারণা : নিরপেক্ষ এবং আপেক্ষিক স্থান	64-72

পৰ্যায় : EGR - 11 : 01

একক 1 ❐ ভূগোল : সংজ্ঞা, মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক, আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ, অবস্থান

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.2 ভূগোলের সংজ্ঞা ও এর পরিবর্তনশীলতা

1.3 ভূগোলের প্রধান বৈশিষ্ট্য

1.4 মানুষ পরিবেশ সম্পর্ক

1.4.1 পরিবেশের সংজ্ঞা

1.4.2 সম্পর্কের গতি প্রকৃতি — পাক্ষিক না দ্বিপাক্ষিক

1.5 পরিবেশের উপাদান

1.5.1 প্রাকৃতিক উপাদান

1.5.2 সামাজিক উপাদান

1.6 প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা

1.7 প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব

1.8 মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের ভবিষ্যত

1.9 আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ

1.10 অবস্থান

1.11 সারাংশ

1.12 প্রশ্নাবলি

1.3 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা

আমরা জানি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ভূগোলকে আধুনিক বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করা হলেও ভূগোলের মূল বিষয়বস্তুগুলি সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। ভূগোল জ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে সবসময়ই মানুষ প্রকৃতির সম্পর্কের ধারণা উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এটাও ঠিক যে সাধারণত ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু বললে প্রাকৃতিক উপাদান যেমন—নদী, পর্বত, উদ্ভিদ, ভূমিরূপ ইত্যাদিকেই

বোঝায়, তার কারণ হল অতীতের ভূগোলবিদ্‌রা বেশি সময় ব্যয় করতেন এই বিষয়গুলির অধ্যয়নের উপর। কিন্তু আজকে 'ভূগোল' বললে শুধু প্রকৃতির উপাদানগুলিকেই বোঝায় না, এর সাথে সাথে মানুষ ও তার কাজকর্ম এবং এর ফলে প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয় তাকেও বোঝায়। অর্থাৎ ভূগোলে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক সমান বা তা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ ও তার কাজকর্ম এবং এর প্রভাব। সময়ের সাথে সাথে একদিকে যেমন জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে ঠিক তেমনি মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদাও বেড়ে চলেছে। এর ফলস্বরূপ মানুষের কাজকর্মের তীব্রতা ও চরিত্রও দ্রুত বদলাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক যেমন বদলাচ্ছে ঠিক তেমনি মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কের অধ্যয়নের গুরুত্বও দিন দিন বাড়ছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভূগোলের সংজ্ঞার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। এখন ভূগোলের সংজ্ঞা (definition) 'ভূ' মানে পৃথিবী ও 'গোল' মানে গোলাকার—এই চিন্তাধারা থেকে আমরা আজকের ভূগোলকে মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের অধ্যয়ন বলে থাকি। আবার মানুষ প্রকৃতির এই সম্পর্ক এক একটা ভৌগোলিক পরিবেশ বা অঞ্চলে এক এক ধরনের। অর্থাৎ ভূগোলের সমস্ত বিষয় বস্তুর চরিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের। একেই আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ (Regional differentiation) বলে। অবস্থানের ধারণা ভূগোলের বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে পুরোনো। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্যের কথা বলতে গেলেই তার মধ্যে ফুটে ওঠে একটি প্রশ্ন 'কোথায়'? অর্থাৎ এই বিষয়টি কোথায় অবস্থিত? ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি স্থান বা অবস্থান একে অন্যের চেয়ে পৃথক।

অতএব ভূগোল বললে মনে রাখতে হবে যে (i) ভূগোলের সংজ্ঞা দ্রুত বদলাচ্ছে। (ii) যার ফলস্বরূপ এর সীমানা বা পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। (iii) মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের পরিবর্তন ও এর প্রভাবের অধ্যয়ন ভূগোলে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। (iv) আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণেরই ধারণা এবং অবস্থানের ধারণা দুটিই ভূগোলের অতি গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- ভূগোলের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।
- ভূগোলের সংজ্ঞার মধ্যে যে বিভিন্নতা ও সময়ের সাথে সাথে সংজ্ঞার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- মানুষপ্রকৃতির সম্পর্ক কেমন তা বুঝতে পারবেন।
- মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব ও প্রকৃতির উপর মানুষের কাজকর্মের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের পরিবর্তন ও তার ফলাফল নির্দেশ করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ কী তা জানতে পারবেন।
- আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণের কারণ নির্দেশ করতে পারবেন।
- অবস্থানের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।

1.2 ভূগোলের সংজ্ঞা ও এর পরিবর্তনশীলতা

ভূগোল কাকে বলে এই সম্পর্কে আপনাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা আছে। অর্থাৎ ভূগোল বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণভাবে আপনারা অবগত। ভূমি ও মানুষের বর্ণনার মৌখিক বিবরণ প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং এর যথাযথ প্রতিফলন হয়েছিল হোমারের রচনায়। প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিত এরাটোসথেনীস (Eratosthenes) সর্বপ্রথম জিয়োগ্রাফি (Geography) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। দুটি গ্রিক শব্দের মিলনে (' Geo' অর্থাৎ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে ভূমণ্ডল বা পৃথিবী এবং ' graphy' অর্থাৎ বর্ণনা বা লেখা) তৈরি জিওগ্রাফি। ভারতের হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রে 'ভূগোল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীর বর্ণনা অর্থে। ভূগোলর দ্রুত বিকাশ ঘটা সত্ত্বেও কিন্তু এই শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেনি বরং কেবলমাত্র এর অধ্যয়নের বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। আজ পর্যন্ত ভূগোলের এই মূল সংজ্ঞা অপরিবর্তিত থাকলেও ভূগোলের সংজ্ঞার পরিধি দ্রুত বেড়ে চলেছে। সভ্যতার আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এই সম্পর্কের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূগোলের সংজ্ঞার পরিবর্তন ও পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুচনাকালে ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন নদী, পর্বত, ভূমিরূপ ইত্যাদি। কিন্তু আজ 'ভূগোল' বললে শুধু প্রকৃতির উপাদানগুলিকেই বোঝায় না, এর সাথে সাথে মানুষ ও তার কাজকর্ম এবং এর ফলে প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয় তাকেও বোঝায়। অর্থাৎ ভূগোলে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তার সমান বা তা থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ' ও তার কাজকর্ম এবং এর প্রভাব। রোমান দার্শনিক স্ট্রাবো (Strabo) ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'ভূগোল আমাদের শেখায় পৃথিবীর জল ও স্থলের সমস্ত জীব সম্পর্কে এবং একই সঙ্গে ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে'।

'ভূগোলের' প্রকৃতি ও পরিধির সবথেকে সর্বাঙ্গীণ সংজ্ঞা পাওয়া যায় গ্রিক দার্শনিক টলেমির (Ptolemy) রচনায়। প্রাচীনকালের বিভিন্ন দার্শনিক ও পণ্ডিতদের রচনা ও কাজকর্ম থেকে ভূগোল সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায় এবং সেই ধারণাটা হল যে 'ভূগোল মূলত দেশ (location) এবং পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন জায়গার আন্তঃসম্পর্কের আলোচনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রায় দু-হাজার বছর আগেই ভূগোল সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল। তখনকার পণ্ডিতেরা মনে করতেন ভূগোল পৃথিবীর আকৃতি, ভূমি ও ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য, বারিমণ্ডল এবং তার আদিবাসী ও অন্যান্য জীবের বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা করে।

প্রাচীনযুগের ভূগোলের এই ধারণাগুলি নতুন করে পুনরায় আলোচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে ভেরেনিয়াসের (Varenius) এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যান্টের (Immanuel Kant) রচনায়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ থেকেই ভূগোলের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট রূপ পেতে শুরু করে। ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ভূগোল স্থান ও অঞ্চলের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির একটি প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করত। ভূগোল জ্ঞানের একটি সুসংহত অংশ বা বিষয় হিসাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও মধ্যযুগের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করে। পরবর্তী সময়ে ভৌগোলিক ধ্যান ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুরোনো অনেক ধারণাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিংবা সংশোধন করা হয়েছে। যেমন টলেমির মানচিত্র এবং বিভিন্ন জায়গার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে তার হিসেব নিকাশ পরের প্রজন্মের মানচিত্র প্রস্তুতকারক ও ভূগোলবিদ্দের প্রভাবিত করেছে। এই ক্ষেত্রে দুজন ভূগোলবিদের নাম—পিটার এপিয়েন (Peter Apian) এবং সেবাস্তিয়েন মুনস্টার (Sebastian Munster) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের দুটি ভৌগোলিক রচনার জন্য। এই দুটি রচনাই যোড়শ শতাব্দীর প্রধান তাত্ত্বিক রচনা হিসাবে ঘণ্য করা হত মূলত জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) এবং গণিত ভূগোলের (mathematical geography) প্রয়োগের জন্য। স্ট্রেবোর রচনার মূল ভিত ছিল এপিয়েন এবং মুনস্টারের এই দুটি তাত্ত্বিক রচনা। ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যময় চরিত্রের বর্ণনা ছিল

প্রাচীনকালের ভূগোলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, উদ্ভিদের বিভিন্নতা, মানুষ ও তার সংস্কৃতি—এগুলির বর্ণনা করাই ভৌগোলিকদের প্রধান কাজ ছিল। তাই ভূগোল সমার্থক ছিল ক্ষেত্রবহুত্ব বিজ্ঞানের (chorology) প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলি বহুবিচিত্র, ভূপৃষ্ঠে তাদের বণ্টন ও বিচিত্র ধরনের এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধও জটিল।

ক্ষেত্রবহুত্ব বিজ্ঞান (chorology) এই বহুত্বের বর্ণনা দেয়।

এই সময় পর্যন্ত ভূগোলের সমস্ত সংজ্ঞার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এখনও পর্যন্ত—

(a) প্রথমত পৃথক শাস্ত্র বা বিষয় হিসাবে ভূগোলের অস্তিত্ব গড়ে ওঠেনি।

(b) দ্বিতীয়ত পৃথিবীর অবস্থা নির্ধারণে মানুষের কোনও বিশেষ ভূমিকা কার্যক্ষমতার স্বীকৃতি পাইনি।

(c) তৃতীয়ত পৃথিবীর আকার, গতি ইত্যাদি জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়গুলি—এখনও পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে।

(d) চতুর্থত কেবল বর্ণনার বদলে 'ব্যাখ্যার' গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।

ভেরেনিয়াস ভূগোল চিন্তার বিকাশে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। কারণ তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক ভূগোল (physical geography) এবং মানবীয় ভূগোল এই দু-ভাগে ভূগোলের বিভাজন ঘটিয়েছিলেন। এর পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র ও তার সমীক্ষা করার কথা বলেন। কান্ট প্রকৃতি ও মানুষের একত্রিতভাবে (unity of nature and man) আলোচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

ভেরেনিয়াসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ভূগোলের দুটি ধারার সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। এই দুটি ধারা বা ভাগ হল বিশেষ ভূগোল (special geography) যা কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গা বিষয় বা অঞ্চলের গভীর অধ্যয়নের ফল এবং সাধারণ ভূগোল (general geography) যা এক বা একাধিক অঞ্চলের সমগ্র কিছুর অধ্যয়ন এবং ভূপৃষ্ঠে তার বণ্টনের অধ্যয়ন। মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে (cote Buffon) কমতে বাফন বারবার আলোচনা করেছিলেন। খুবই আশ্চর্যজনকভাবে আজকে থেকে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে বাফন মানুষের সৃষ্টির ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে বিশ্বাস করতেন। উনি মৃত্তিকা সম্পর্কেও অধ্যয়ন করেছিলেন।

ভূগোলের বর্ণনার নতুন ধারণা মূলত জার্মান পণ্ডিতদের অবদান। ভূগোলের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্নজনে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। জার্মান পণ্ডিত জোহান খ্রিস্টপ গেটেরার (Johann Christoph Gatterer) ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের দেখা পৃথিবীর বর্ণনা।' এই সময়কার অন্যান্য জার্মান ভূগোলবিদ্‌রাও বিশ্বাস করতেন যে ভূগোলে প্রাকৃতিক বর্ণনার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ভেরেনিয়াসের প্রায় সমসাময়িক অন্য এক ভূগোলবিদ্ ক্লুভেরিয়াস (Cluverius –1580-1622) Introduction to General Geography নামে ৬টি Volume-এর একখানা বই লেখেন। এই বইয়ের ভিত (basis) ছিল ইউরোপ অভিজ্ঞতা। এই ৬টি বইয়ের মধ্যে কেবল একটিতে পৃথিবীর বর্ণনা এবং বাকি পাঁচটিতে বিভিন্ন দেশের (country) বর্ণনা ছিল। ক্লুভেরিয়াস সাধারণ ভূগোলের (General Geography) প্রবক্তা ছিলেন।

ভূগোলের সংজ্ঞা বা ভূগোল শাস্ত্রের বিকাশে ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant –1724-1804) এর অবদান অপরিসীম। মানুষের অভিজ্ঞতাকে কান্ট দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন—বর্ণনামূলক বা ঐতিহাসিক এবং বর্ণনামূলক বা ভৌগোলিক। প্রাকৃতিক ভূগোলকে (Physical Geography) উনি প্রকৃতির সারাংশ (Summary of Nature) হিসাবে মানতেন। গাণিতিক (গঠন, আয়তন, পৃথিবীর গতি), চরিত্র (moral) (the customs and character of man), রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক (commercial) এবং ধার্মিক (ধর্মের বণ্টন) এই পাঁচটিকে কান্ট ভূগোলের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কান্ট পৃথিবীর বিভাগীকরণ (a real disvision of the earth)- কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আধুনিক ভূগোলের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দু'জন জার্মান পণ্ডিত

হলেন আলেকজাণ্ডার ভন হামবোল্ট এবং কার্ল রিটার। এদের নেতৃত্বেই আধুনিক ভূগোলের যাত্রা শুরু হয়। আধুনিক ভূগোলের ভিত্তি স্থাপন করেন এই দুজনেই। যার জন্য হামবোল্ট ও রিটারকে আধুনিক ভূগোলের জনক বলা হত। হামবোল্টের মতে ভূপৃষ্ঠে পাওয়া সব কিছুর সমীক্ষা ও বর্ণনা করাই হল ভূগোল। অন্যদিকে কার্ল রিটার মনে করতেন ভূগোল হল বিজ্ঞানের সেই শাখা যা পৃথিবীর সমস্ত বিষয়, বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক সহ তাকে পৃথক একক হিসাবে বিচার করে। হামবোল্ট ও রিটারের সংজ্ঞার যে বক্তব্যটি আজকের দিনের ভৌগোলিকরাও মেনে নিয়েছেন তা হল ''ভূগোলই হল আদি মাতৃসম শাস্ত্র যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভূআকৃতি বিজ্ঞান (Geomorphology), আবহবিজ্ঞান (Climatology or Climate Science), মৃত্তিকা বিজ্ঞান, (Soil Science), উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Plant Geography) এবং আঞ্চলিক বিজ্ঞান (Regional Science) বিশেষায়িত শাখা।

রিটার ও হামবোল্টের গবেষণার প্রধান বিষয় হল :

- প্রাকৃতিক ঐক্যে বিশ্বাস (Unity of nature)
- কার্যকারণ সম্বন্ধ (Cause and effect relation)
- মানবকেন্দ্রিকতা (Anthropcentrism)
- অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Empirical approach)

অন্যদিকে আধুনিক ভূগোলের অন্যতম ভূগোলবিদ্ হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড হার্টশোর্ণ (Richard Hartshrone)। ১৯৩৯ সালে হার্টশোর্ণ ভূগোল সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন—'ভূগোলের কাজ হল ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনশীল চরিত্রের নির্ভুল, নিয়মবিন্যস্ত ও যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া। হার্টশোর্ন ছিলেন 'অঞ্চল' ধারণার দৃঢ় সমর্থক, তার মতে বহু বিচিত্র চরিত্রের এই ভূপৃষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড করে প্রাকৃতিক বা সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অঞ্চলে ভাগ করে সমীক্ষার মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে ভূগোলকে শেখা যায়। হার্টশোণের এই চিন্তাধারাকে ভাবলেখী (idiographic) চিন্তাধারা বলা হত।

অনেক পণ্ডিতের মতে হামবোল্ট ও রিটার ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক (Complementary)। হামবোল্ট যেখানে প্রণালীবদ্ধ ভূগোলের (Systematic Geography) পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন রিটার সেখানে আঞ্চলিক ভূগোলের আলোচনা করেছেন। এই দুজনের মিলনের ফলেই ভূগোল পরিণত হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক পৃথক বিষয়ে।

1.3 ভূগোলের প্রধান বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ভূগোলের সংজ্ঞাও আলাদা। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময় ভূগোলের সংজ্ঞা ভৌগোলিকরা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। যার জন্য ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেক সময় বলা হয় 'ভৌগোলিকরা যা করেন তাই ভূগোল।' ভূগোলের গতি প্রকৃতি যেমন বদলাচ্ছে ঠিক তেমনি ভৌগোলিক সমীক্ষার গুরুত্বও এই বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সরে গেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভূগোলের গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়।

এগুলি হল ঃ—

১. অবস্থান (Location)

২. বস্তু সংস্থানগত বা মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক (Ecological or man-nature relation) এবং

৩. আঞ্চলিক (Regional)

১. অবস্থান (Location) : অবস্থানের ধারণা সম্ভবত ভূগোলের অন্যান্য সমস্ত ধারণা মধ্যে সবচেয়ে পুরানো। ভূগোলের ভিতটাই হলো অবস্থান। 'ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্য তখনই প্রশ্ন উঠে— 'কোথায়'? অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টি কোথায় অবস্থিত? ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি স্থান বা অবস্থান একে অন্যের চেয়ে পৃথক। যার ফলে সেখানকার প্রাকৃতিক ও মানবীয় সমস্ত বিষয়গুলি পৃথক ভাবে সনাক্ত করা প্রয়োজন।

ভূগোল শাস্ত্রে এই অবস্থান বা দৈশিক অবস্থানকে নির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ দ্বারা নির্ধারিত অবস্থান, পরবর্তীযুগে আপেক্ষিক অবস্থান (relative location) এবং সর্বশেষ বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে ভূগোল। আধুনিক ভূগোলে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের অবস্থান (কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যদি) এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ অবস্থানের ধারণাকে বাদ দিয়ে ভৌগোলিক সমীক্ষা হয় না বা একে ভূগোল বলা যায় না।

২. বাস্তু সংস্থানগত বা মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক (Ecological or Man-nature relation) ভূগোলের সংজ্ঞা এবং গতিপ্রকৃতি থেকে একথা পরিষ্কার যে ভূগোল শাস্ত্রে 'মানুষ' ও প্রকৃতির বিশেষ এক স্থান রয়েছে। এটাও ঠিক যে মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক, এই সম্পর্কের প্রভাব ও ফলাফল ইত্যাদি সমীক্ষা করাই ভূগোলবিদ্‌দের প্রথম এবং প্রধান কাজ। মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক যেহেতু এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেক্ষেত্রে মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব এবং মানুষ তার ক্রিয়াকলাপ (কাজকর্ম), তার গতি প্রকৃতি ও কাজকর্মের গভীরতার ফলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এই পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে ভৌগোলিকদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। ভৌগোলিকদের একাংশের মতে প্রকৃতি মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অন্যদিকে অন্য একাংশের মতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ নিজের অনেক প্রয়োজনই নিজে মিটাতে পারে। মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। মানুষ নিজের অনেক প্রয়োজনই নিজে মিটাতে পারে। মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। জার্মানির আলেকজাণ্ডার ভন হামবোল্ট (Alexander Von Humbolt) মনে করতেন মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কে প্রকৃতিই প্রধান। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে মানুষের যে জীবনযাত্রার ধরন গড়ে উঠে তা নির্ধারণ করে প্রকৃতি। প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা স্থান ভেদে বিভিন্ন পর্যায়ের হয়। মানুষের জীবনে প্রকৃতির প্রাধান্যতাকে হামবোল্ট ছাড়াও যারা স্বীকার করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফ্রেডরিক র‍্যাটজেল (Fredric Retzel) কার্ল রিটার (Carl Ritter), গ্রিফিথ টেইলর (Griffith Taylor), এলস্‌ওর্থ হান্টিংটন (Ellsworth Huntington)।

মানুষ প্রকৃতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতিকে মুখ্য এবং প্রভাবশালী বলে মনে করেন তাকে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Environmental Determinism) বলা হয় এবং যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতি মানুষের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে সক্রিয় ও মুখ্য বলে মনে করেন তাকে সম্ভাবনাবাদ (Possibilism) বলা হয়। ফরাসি পণ্ডিত (ইতিহাসবিদ্) লুসিয়ানা ফেভার (Luciena Febvre) এই মতবাদের প্রবর্তক। ভূগোলে এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন ভাইডেল ডিলা ব্লাশ (Vidal de-la Blache)।

৩। আঞ্চলিক (Regional) ঃ ভূগোলের এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কোনো স্বকীয় বা আলাদা বৈশিষ্ট্য নয়। প্রথম দুটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অবস্থান (Location) এবং বাস্তুসংস্থানগত বা মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক (regional) বৈশিষ্ট্যের। অর্থাৎ অবস্থান, অঞ্চল বা স্থানভেদে মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক, এর গতিপ্রকৃতি আলাদা ধরনের হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের চরিত্রে তারতম্য চোখে পড়ে। প্রকৃতির ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই তারতম্যের জন্যই মানুষও অন্যান্য প্রাণীর জীবনযাত্রার ধরনের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা বা তারতম্য দেখা যায়।

1.4 মানুষ- পরিবেশ সম্পর্ক

মানুষ-পরিবেশের সম্পর্ক এবং মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক (Man-nature relation) বলতে আমরা মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পর্ককেই বুঝি। মানুষ -পরিবেশ সম্পর্ক অতি প্রাচীন। সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ এবং পরিবেশের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের এই ধারণাটা অতি প্রাচীন হলেও সম্পর্কটা কী ধরনের তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের প্রসঙ্গ উঠা মানেই দুটো প্রশ্নের আবির্ভাব হয়। (i) প্রথমত মানুষ আর প্রকৃতি দুটি কি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়? (ii) নাকি মানুষ-প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী অংশ?

মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক আলোচনা করার আগে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার এটাও ঠিক যে এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের আগে পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত।

1.4.1 পরিবেশের সংজ্ঞা (Definition of Environment)

সহজ ও সরলভাবে বলতে গেলে আমরা আমাদের চারপাশে যা যা দেখতে পাই তাহাদের সমষ্টিকেই সাধারণত পরিবেশ বলে। আর এই পরিবেশ বা প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ মানুষ সামগ্রিক পরিবেশের একটা অংশ। এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা উচিত যে মানুষকে বাদ দিয়ে পরিবেশ হয় না। আমাদের চারপাশের ভূ-দৃশ্যাবলী, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত, মানুষ ও মানুষের সৃষ্টি অর্থাৎ ঘরবাড়ি, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, আবাহাওয়া, মাটি ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে একসাথে পরিবেশ বলে।

1.4.2 মানুষ-পরিবেশ পাক্ষিক না দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতি প্রকৃতি

সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের প্রকৃতি ও চরিত্র নিয়ে বহুকাল ধরে মতানৈক্য আছে। এই মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের একটা বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া উচিত যে মানুষ-পরিবেশের সমহত তাহার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ও উন্নত করার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরও দুটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। প্রথমত মানুষ কি পরিবেশ দ্বারাই গঠিত নাকি মানুষ পরিবেশকে গঠন করেছে? এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্য দেখা যায়। অনেকের মতে মানুষ প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগের জীব, পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার অনেকের মতে মানুষ পরিবেশের দ্বারাই গঠিত।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই অনেক ভৌগোলিকের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল মানুষের উপরে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার অনুসন্ধান। মানুষের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে এই ভৌগোলিকদের ধারণা ছিল যে মানুষ প্রকৃতির শক্তির দ্বারা রূপায়িত নিষ্ক্রিয় এক জীব। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রে ভৌগোলিকদের কাজ হল এই সম্পর্ককে চিহ্নিত ও নির্ধারণ করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগঠন ও উপস্থাপিত করা। মানব সভ্যতার একেবারে শুরু থেকে অর্থাৎ মানুষ বা Homosapines পৃথিবীতে তার প্রথম দিন থেকেই পরিবেশের সাথে একটি একমুখী বা পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করে। সেই সম্পর্কের একমাত্র ভিত (basis) ছিল খাদ্য আহরণ। মানুষ তাঁর প্রথম অবস্থায় গাছের ফল ও মূল যা প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত তা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। এবং তা গাছের নীচে পড়ে থাকা অবস্থা থেকে আহরণ করত। এতে বিশেষ কিছু শ্রম বা কোনো প্রযুক্তির প্রয়োজন যেমন হত না ঠিক তেমনি মানুষ আহারের জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। অর্থাৎ মানুষ এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করত না। মানুষের এই প্রকৃতি-নির্ভরশীলতার সভ্যতাই জন্ম দেয় এক চিন্তাধারার যাকে বলা হয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণবাদ (Environmental Determinism)।

মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কটা সূচনাকালে পাক্ষিক বা একতরফা ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেখা গেছে আসলে এই সম্পর্কটা দ্বি-পাক্ষিক। একসময় মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু অস্তে আস্তে মানুষের প্রকৃতি বা পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে। মানুষ এখন তেমনভাবে নির্ভরশীল নয়। মানুষ ক্রমশ স্বনির্ভরশীল হচ্ছে। একদিকে যেমন ক্রমশ এই নির্ভরশীলতা কমছে ঠিক তেমনি মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রকৃতি বা পরিবেশকে ব্যবহারের ফলে মানুষ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মানুষের দ্বারা প্রকৃতির এই পরিবর্তন কখনো কখনো এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তা মানুষের বিপদ ডেকে আনছে। অর্থাৎ মানুষ যেমন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, প্রকৃতি মানুষকে প্রভাবিত করে ঠিক একই ধরনে মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করে। অর্থাৎ মানুষ পরিবেশের এই সম্পর্ক পারস্পরিক একটা সম্পর্ক।

1.5 পরিবেশের উপাদান (Components of Environment)

পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আগেই দেখা যায় যে সমষ্টিগতভাবে তাদেরকেই পরিবেশ বলা হয়। অর্থাৎ পরিবেশ বললে একসাথে অনেক কিছুকে বোঝায়। চারপাশে যাদের সমষ্টিকে পরিবেশ বলা হয় এদেরকে পরিবেশের উপাদান বলা হয়। পরিবেশের সমস্ত উপাদানকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। (i) প্রাকৃতিক উপাদান (Physical component) এবং (ii) সামাজিক উপাদান (Social Component)।

1.5.1 প্রাকৃতিক উপাদান (Physical Component of Environment)

পরিবেশের যে উপাদানগুলি সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠে দেখা যায় তাদেরকে পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান বলে। এই উপাদানগুলি হল—নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, ভূমিরূপ, উদ্ভিদ, আবহাওয়া, মরুভূমি, মৃত্তিকা ইত্যাদি। এই উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য হল এদেরকে প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়।

1.5.2 পরিবেশের সামাজিক উপাদান (Social Component of Environment)

মানুষ তার বণ্টন ও তার কাজকর্ম ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিকেই সাধারণত পরিবেশের সামাজিক উপাদান বলা হয়। সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিবেশের একটা সম্পর্ক আছে। পরিবেশের এই সামাজিক উপাদানগুলি হল—জনসংখ্যা, তার বণ্টন ও ঘনত্ব, বাসস্থান, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের কাজকর্ম ও তার ধারা।

পরিবেশের সাথে এই উপাদানগুলির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুটোই। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে পরিবেশের উপর মানুষের কাজকর্মের প্রভাব ও তার ধরণ নির্ভর করে শিক্ষা ও প্রযুক্তির মানদণ্ডের উপর। ঠিক তেমনি জনসংখ্যা বা এর আকৃতির (size) উপর অনেকখানি নির্ভর করে পরিবেশের ব্যবহার।

1.6 প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা (Dependency of man on nature)

জন্ম লগ্ন থেকেই মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অতীতে মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। মানুষের এই প্রকৃতি নির্ভরশীলতার গভীরতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির স্তরের উপর নির্ভরশীল। আদিমযুগে কোনো প্রযুক্তিই মানুষ ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখতেন না। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে। আদিম যুগে খাদ্য সংগ্রহ বা আহরণই মানুষের প্রধান কাজ ছিল। প্রথম অবস্থায় মানুষ খাদ্যের জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। গাছের ফল ও মূল দিয়ে মানুষ খাদ্যের চাহিদা মেটাতেন। এক সময় গাছের ফল ও মূল যা গাছের নীচে পড়ে থাকত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত তা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। পরবর্তী

পর্যায়ে যখন খাদ্যের (ফল ও মূল) সংকট দেখা দিল অর্থাৎ যে ফল পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছের নীচে পড়ে থাকতো এখন আর তত বেশি ফল গাছের নীচে পাওয়া যাচ্ছে না কারণ মানুষের বিভিন্ন সমষ্টি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত খাদ্যের জন্য। সবই গাছের নীচের ফলগুলো খাওয়ার ফলে খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ গাছে ঢিল বা বড়ো কিছু ছুঁড়ে দিয়ে গাছের ফল পাড়ার ক্ষমতা অর্জন করল মানুষ। এই ঢিল ছোঁড়াটাই হল প্রথম এবং আদিম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ তার শ্রম (labour) দেওয়া শুরু করল। এই ঢিলছোঁড়ার প্রযুক্তিই হল প্রযুক্তির প্রথম ধাপ। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে খাদ্য সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করল। এই সংকটের প্রভাবের ফল হিসাবে মানুষ নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার উদ্ভাবন ও ব্যবহার শুরু করল। এই নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার সাথে প্রযুক্তির উপর মানুষের নির্ভরশীলতাও কমতে লাগল।

1.7 প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব (Influence of man on nature)

প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব হল মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কের একটা দিক। মানুষ-প্রকৃতির এই সম্পর্ক যেহেতু এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সেক্ষেত্রে মানুষের উপর প্রকৃতির ও প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব থাকবেই। এই পারস্পরিক প্রভাবের ক্ষেত্রে মতানৈক্য না থাকলেও এই প্রভাবের দিক নিয়ে বিভিন্ন মতামত আছে। মানুষ তার প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রকৃতির উপাদানগুলিকে এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার করে। আবার এই ব্যবহারের পরিধি নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন ও প্রযুক্তির স্তরের উপর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনের সীমানাও বেড়ে যাচ্ছে। যার ফল স্বরূপে মানুষ প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক সম্পদকে নিবিড় ও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। এই নিবিড়ভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। এর ফলে প্রকৃতির উপর মানুষ যে প্রভাব ফেলছে তা ক্ষতিকারক অর্থাৎ মানুষের প্রভাবের ফলে সাধারণত প্রকৃতির ক্ষতি হচ্ছে। বেশি ক্ষেত্রেই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব ঋণাত্মক।

1.8 মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের ভবিষ্যত (Future of man-nature relation)

আধুনিক ভৌগোলিকরা মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সম্পদের চাহিদা মাত্রাধিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ পরিবেশ অবনমনে সব থেকে বেশি দায়ী। অর্থাৎ প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব বেশি ক্ষেত্রেই ঋণাত্মক। মানুষ অজ্ঞানের এবং অনেকক্ষেত্রে সজ্ঞানেই প্রকৃতির ক্ষতি করে চলেছে। প্রকৃতির উপর মানুষের এই ঋণাত্মক প্রভাব কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্রেই যে মারাত্মক ক্ষতিকারক তা নয়,. মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেও সমান ক্ষতিকারক এবং বিপদজনক। এই বিষয়টা সবাইয়ের জন্যই উদ্বেগের। এই জন্যই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আধুনিক ভৌগোলিকরা মানুষ পরিবেশ সম্পর্কটাকে একটা নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ মানুষের স্বার্থে, নিজের চাহিদা মেটাতে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য যাতে বজায় রাখতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। মানুষ-পরিবেশের সম্পর্কটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখাটাই বর্তমানে উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। তা না করতে পারলে মানুষ-পরিবেশের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটবে।

1.9 আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ

পরিবেশের উপাদানগুলির চরিত্র এক এক অঞ্চল বা জায়গায় এক এক ধরনের হয়। অর্থাৎ অঞ্চল ভেদে

ভূগোলের উপাদানগুলির চরিত্রে বিভিন্নতা দেখা যায়। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের চরিত্রে তারতম্য দেখা যায়। এই অঞ্চলভিত্তিক তারতম্যের ধারণাকেই আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ (regional differentiation) বলা হয়। এই ধারণার পিছনে তিনটি যুক্তি রয়েছে :

(ক) ভূ-সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের মধ্যে ঐক্য বা পারস্পরিক সম্পর্কে লক্ষ করা যায়।

(খ) এই বিষয়গুলি আবার নানান ধরনের এবং ভূ-পৃষ্ঠের এক একটি অংশে পারস্পরিক সম্পর্কের গতি প্রকৃতি আলাদা ও কখনো জটিল হয়; এবং

(গ) এই জটিল ও সামগ্রিক সম্পর্কের দৈশিক প্রকাশ ভূগোলে 'অঞ্চল' হিসাবে সমীক্ষা করা যায়।

আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ ধারণায় ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিটি একক এলাকা গুণগতভাবে অদ্বিতীয় এবং একে অন্যের থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক। বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সেখানে এমনই নিবিড় যে আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে চোখে পড়ার মতো সমধর্মিতা রয়েছে। এই বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে মানুষ ও পরিবেশের নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে। তার ফলে প্রাকৃতিক ও মানবীয় বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে তৈরি করেছে এক পৃথক অস্তিত্ব।

আঞ্চলিক ধারণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীর সমীক্ষার বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিতি। এখানে জোর দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলিতে এবং কিভাবে মানুষ সেখানে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং পরিবেশের বদল ঘটাচ্ছে তার উপর।

1.10 সারাংশ (Summary)

ভূগোলের সংজ্ঞা বিভিন্ন ভৌগোলিক বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এর সংজ্ঞা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। বর্তমানে মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের অধ্যয়নকে 'ভূগোল' বলা হয়। অতীতে প্রাকৃতিক উপাদনগুলিই ভূগোলে চর্চার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। পরবর্তীকালে মানুষ তার কাজকর্ম, গুণাগুণ ও ফলাফলকেও ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও মানবীয় বিষয় উভয়েই ভূগোলের প্রধান অঙ্গ। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই পরিবেশ বলা হয়। মানুষকে বাদ দিয়ে চারপাশে যা দেখা যায় অর্থাৎ—নদনদী, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ, বনভূমি, মৃত্তিকা, আবহাওয়া ও তার উপাদানগুলিকেই পরিবেশ প্রাকৃতিক উপাদান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঠিক তেমনি মানুষ, তার কাজকর্ম, শিক্ষা, বাসস্থান, জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক মূলত দ্বিপাক্ষিক। প্রকৃতি যেমন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে ঠিক একই ধরনের মানুষ ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। মানুষের প্রভাবের ফলে অনেক সময় প্রকৃতির অবনমন ঘটে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হোক তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

1.11 প্রশ্নাবলি

1. ভূগোলের সংজ্ঞা দিন?
2. ভূগোলর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

3. আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ বলিতে কী বোঝায়?
4. পরিবেশ কাকে বলে?
5. পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানগুলি কী কী?

1.12 উত্তরসংকেত

1. উত্তরের জন্য 1.2 অংশ দেখুন।
2. উত্তরের জন্য 1.3 অংশ দেখুন।
3. উত্তরের জন্য 1.9 অংশ দেখুন।
4. উত্তরের জন্য 1.4.1 অংশ দেখুন।
5. উত্তরের জন্য 1.5.1 অংশ দেখুন।

একক 2 ❐ ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশ

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.2 ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশ — সংক্ষিপ্ত আলোচনা

2.3 ভূগোলের প্রধান প্রধান প্রবণতা সমূহ

2.4 তথ্যমূলবাদ বা বিশ্বকোষবাদ

2.5 প্রত্যক্ষবাদ

2.6 পরিবেশের উপাদান

2.6.1 সূচনা

2.6.2 রাশিমাত্রিক বিপ্লবের গুণাগুণ

2.7 মূলক ভূগোল

2.7.1 উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা

2.8 সারাংশ

2.9 প্রশ্নাবলী

2.10 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

সময়ের সাথে সাথে ভূগোল বিভিন্ন ভাগে সরু সরু খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভাজন ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত তা নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু বা কেন্দ্র বলিতে ভূগোলর দর্শন (philosophy)-কে বোঝায়। ভূগোলের দর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে ভূগোল চিন্তার বিকাশের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে।

ভূগোল চিন্তার বিকাশ বা ভূগোল চিন্তার ইতিহাস দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা যায়। প্রথমত ঐতিহাসিক বা কালক্রমানুসারী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং চিন্তার যুক্তিসঙ্গাত বিকাশ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ভূগোল চিন্তার বিকাশের অধ্যয়নের মাধ্যমে ভূগোল শাস্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে জানা যায়। অর্থাৎ এই অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত থাকে ভূগোলের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিকাশ এবং প্রসার।

আদিকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির সার্থক বিশ্লেষণ থাকে এই ভূগোল চিন্তার বিকাশের অধ্যয়নে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- ভূগোল শাস্ত্রের বিকাশের ইতিহাস জানতে পারবেন।
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভূগোলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কী পরিপ্রেক্ষিতে ভূগোল শাস্ত্র বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- ভূগোলের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- কিসের ভিত্তিতে ভূগোলের বিভাজন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভূগোলের প্রধান প্রবণতা সমূহ নির্দেশ করিতে পারবেন।
- রাশিমাত্রিক বিপ্লবের উৎপত্তি ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

2.2 ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশ — সংক্ষিপ্ত আলোচনা (Evolution of Geographical thought–a brief discussion)

দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভূগোল চিন্তার বিবর্তন সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যায়। প্রথমত ঐতিহাসিক কালক্রমানুসারে এবং দ্বিতীয় ভূগোল চিন্তার যুক্তিসঙ্গত বিকাশ দৃষ্টিকোন থেকে। ভূগোল চিন্তার বিবর্তনের অধ্যয়নকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত কালক্রমানুসারে এবং দ্বিতীয় ভূগোলের দর্শন এবং পদ্ধতিগতভাবে।

বিভিন্ন ভৌগোলিক ভূগোলকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ভূগোলের বিষয়বস্তুর উপর ভিত করে ভূগোলকে যতটুকু না ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পদ্ধতির উপর। ভূগোলের সমস্ত ঘটনাবলির কালক্রমানুসারে অধ্যয়ন করাটা অসম্ভব। এর কারণ হচ্ছে যে ভূগোলের বিষয়টির পরিধি বা এর বিশালতা এবং ভৌগোলিক ঘটনাবলির সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব। এই দুই কারণের জন্যই কালক্রম অনুসারে সমস্ত ঘটনা অধ্যয়ন অসম্ভব। ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশ বা ভূগোলের বিকাশের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে তাকে আমরা কতগুলো অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রত্যেকটা অধ্যায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করা হ'ল।

এই অধ্যায়কে ৭টা ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) প্রথম পর্যায় হল তৃতীয় খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এই প্রথম পর্যায়ে সিংহভাগ ভূগোলের বিকাশ ঘটে গ্রিসে কারণ ভূগোল শাস্ত্রে গ্রিক পণ্ডিতদেরকে সূচনাকারী হিসাবে গণ্য করা হত। ভূগোলের বিকাশের ক্ষেত্রে এদের অবদান অপরিসীম। এদের মধ্যে এরাটোসথেনীস, থেমার, প্লুটো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভূগোল শাস্ত্রের সংজ্ঞা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য অবদান। গ্রিকদের আগে ইহুদি, ইজিপ্তসিয়ান ও ফোয়েনেসিয়ানসরাও ভূগোলের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এগুলো অষ্টম এবং নবম খ্রিস্ট পূর্বের ঘটনা। কিন্তু এদের অবদান বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। কারণ এদের দেশে ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রচলন ছিল না।

(ii) দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ব্যাপ্তি হচ্ছে খ্রি. পূ ৩য় শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়কে গঠন মূলক অধ্যায় হিসাবে ধরা হয়েছে। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতরা হলেন টলেমি, স্টেবো, হিরোডোটিস। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন আরবীয় ভূগোলবিদ্ ভূগোলের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে ভূগোল শাস্ত্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন টলেমি। এছাড়াও টলেমি মানচিত্র অঞ্চলের পদ্ধতি আলোচনা করেছিলেন। হিরোডোটাস প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি উপজাতি এবং তাদের জীবনধারা সমেত ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের আলোচনা করেছিলেন। অন্য দিকে স্ট্রেবো ভূগোলের বিভিন্ন শাখা যেমন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক এবং গাণিতিকের

আলোচনা করেন। ভূগোলকে বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিভাজনের সূচনা হয় এই সময়ের মধ্যেই। দার্শনিক মতবাদের দিক থেকে এই যুগে আদর্শবাদ বা ভাববাদের প্রাধান্য ছিল।

(iii) পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেকার সময়টুকু ভূগোল শাস্ত্রের বিকাশের তৃতীয় পর্য্যায়। এই সময়ে প্রাচীন ধ্যানধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। বস্তুবাদ ও আদর্শবাদ উভয়েই এই যুগের দার্শনিক ভিত।

(iv) অষ্টাদশ শতাব্দীর ভূগোল এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ যুগ। কারণ এই শতাব্দী থেকেই ভূগোল পদ্ধতিগতভাবে বিভাজন শুরু হয়। এই যুগকে প্রাক্ বৈজ্ঞানিক যুগ বলেও জানা যায়। ভূগোলকে সাধারণ (General) এবং বিশ্বকেন্দ্রীক (Universal) দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। পরবর্তীকালে এই দুটো ভাগকে আঞ্চলিক ভূগোল (Regional Geography) এবং প্রথাগত বা প্রণালীবদ্ধ ভূগোল হিসাবে জানা যায়। এই দুটি বিভাজন করা হয় ভূগোলের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। ভূগোলকে ভাগ করা হয় তাত্ত্বিক (Therotical) এবং ভাবলেখী (Idiographic) ধারণায়। তাত্ত্বিক ভূগোল তত্ত্ব, মডেল আদিতে বেশি গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে ভাবলেখী ভূগোল কোনো দেশের ভূমি, সাগর, পর্বত ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বর্ণনাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। এই ভূগোল তত্ত্ব গঠনে আগ্রহ দেখায় না। এই যুগের উল্লেখযোগ্য অবদানকারীদের মধ্যে ইমানুয়েল ক্যান্ট এবং ভেরেনিয়াস উল্লেখযোগ্য।

(v) পঞ্চম পর্যায়টা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর ভূগোল। এই সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নতুন জায়গার আবিষ্কার, মানচিত্র অঞ্চল পদ্ধতির ব্যবহার এবং আঞ্চলিক ও প্রণালীবদ্ধ ভূগোলের বিকাশ। এই যুগেই বৈজ্ঞানিক পরিমাপ তত্ত্ব এবং ফিল্ড ওয়ার্ক (Field Work)-এর সূচনা করেন হামবোল্ট। এই যুগকে ভূগোলের বৈজ্ঞানিক যুগ বলা হয়। এই যুগের আরও বৈশিষ্ট্য হল বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে আলাদাভাবে ভূগোলের বিভাগ খোলা (১৮৭০), পরিবেশের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের কার্যক্ষমতা, সৃজনশীলতাকে আস্তে আস্তে স্বীকৃতি দেওয়া এই যুগের অবদান। এই সময়ের মধ্যেই লুসিয়ান ফেভার সম্ভাবনাবাদ দর্শনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই যুগের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল প্রত্যক্ষবাদ (Positivism)-এর জন্ম। এই যুগের যুগান্তকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হামবোল্ট, কার্ল রিটার, ডাইডেল ব্লাচ, রিকচোথোফেন, চিস্‌লম উল্লেখযোগ্য।

(vi) ষষ্ঠ পর্যায় হল বিংশ শতাব্দীর ভূগোল। বিংশ শতাব্দীর ভূগোলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভূগোলকে সমাজমুখী করে গড়ে তোলা। দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভূগোলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কের অধ্যয়ন এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাংস্কৃতিক ভূগোল, সামাজিক ভূগোল, রাশিমাত্রিক বিপ্লব, ফলিত ভূগোলের উৎপত্তি এবং ভূগোলে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এই যুগের মূল আলোচ্য বিষয়। প্রত্যক্ষবাদ এই যুগের প্রধান দার্শনিক ভিত্তি, এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ভূগোলবিদ্‌রা হলেন ডেভিস, মিল, কার্ল সাওয়ার, হেটনার, ব্রুনহেজ, খ্রিস্টলার আদি।

(vii) ভূগোল চিন্তার বিকাশের সপ্তম এবং শেষ পর্যায়টা হল বর্তমান কাল বা বর্তমানের ভূগোল। চারিত্রিক দিক থেকে এই যুগের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান হল সমাজের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োগ। এই যুগে প্রত্যক্ষবাদের প্রাধান্যতা ক্রমশ কমতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, সামাজিক অস্থিরতা, পরিবেশের অবনমন ইত্যাদি বিষয়গুলি এবং প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানের উপর মানুষের বিশ্বাসকে দুর্বল করতে শুরু করে। দারিদ্র্যতা, জাতিগত সমস্যা, লিঙ্গাবিদ্বেষ ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পাওয়া শুরু করে। ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা ও ধর্ম কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা এই যুগের অবদান। মানবীয় ভূগোল আচরণমূলক ভূগোল ও মূলক ভূগোল এযুগের অবদান। ভূগোলে মার্ক্সবাদের প্রভাব এই যুগের জন্য এক বৈশিষ্ট্য।

2.3 ভূগোলের প্রধান প্রবণতা সমূহ (Major trends in Geography)

ভূগোল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে টি. ডব্লু, ফ্রিম্যান বিগত একশো বৎসরের মধ্যে (১৮৬০-১৯৬০) কতকগুলি নতুন প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন। সারা বিশ্বজুড়ে ভূগোল শাস্ত্রের অধ্যয়নের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়,. যে কতগুলি প্রবণতা ভূগোল শাস্ত্রের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে। ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রবণতাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোলের এই ছয়টি প্রবণতা হল—

(১) তথ্যমূলক প্রবণতা (Encyclopaedic trend), (২) শিক্ষামূলক প্রবণতা (Educational trend), (৩) প্রবণতা ও ঔপনিবেশিক প্রবণতা (Colonial trend), (৪) সাধারণীকরণ প্রবণতা (Generalisation trend), (৫) রাজনৈতিক প্রবণতা (Political trend), (৬) বিশেষায়ন প্রবণতা (Specialisation trend)।

১) পর্যটকদের অভিযানে ভৌগোলিক তথ্য আহরণের মাধ্যমে এর শুরু। আধুনিককালে গবেষকদের 'ক্ষেত্রীয় সমীক্ষা' ফিল্ড-ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার প্রবণতাকেই তথ্যমূলক প্রবণতা বলা হয়।

২) নানা ভৌগোলিক সংগঠন বিশেষত বিভিন্ন ভৌগোলিক সোসাইটি বহুদিন ধরে সাধারণ শিক্ষালাভের অঙ্গ হিসাবে সুদক্ষ ভৌগোলিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভব করে এসেছে। একেই শিক্ষামূলক প্রবণতা বলা হয়।

৩) নতুন নতুন ভূভাগের সম্ভাব্য সম্পদ ও সমস্যার মূল্যায়ণে ভূগোলের ব্যবহারিক উপযোগিতা বাণিজ্যিক ভূগোলে লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটায়। এর মাধ্যমে ভৌগোলিক গবেষণার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তীকালে বৈচিত্র্যময় গবেষণার জন্ম হয়েছে। একেই ঔপনিবেশিক প্রবণতা বলে।

৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ভূগোল শাস্ত্রের বিকাশে ভৌগোলিকদের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন সামগ্রিক ধাঁচ বোঝার চেষ্টা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। এটাই হল সাধারণীকরণ প্রবণতা।

৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সম্পদ বণ্টনের তারতম্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রবণতাকে রাজনৈতিক প্রবণতা বলা হয়।

৬) ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত ভূগোলে এক নতুন প্রবণতা পাওয়া যায়। সেটা হল ভৌগোলিক স্থান আহরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ দক্ষতা গড়ে তোলাটা আধুনিক ভূগোলের উল্লেখযোগ্য দিক। এটাকেই বিশেষায়ণ প্রবণতা বলা হয়।

2.4 তথ্যমূলবাদ

ভৌগোলিক অভিযানের মাধ্যমে তথ্য আহরণ এই প্রবণতার উৎস। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের মানদণ্ড বিভিন্ন ধরনের। এই প্রবণতা ভূগোলে বর্ণনার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের ফলে ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিসীমা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের বর্ণনামূলক ভৌগোলিক রচনা কখনও কখনও প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। ফলে পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে তার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। আধুনিক ভূগোলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মূল ভিত হচ্ছে অভিযান ও ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। অর্থাৎ এই ধরনের তথ্য বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরে। আজকের দিনের ভূগোল আধুনিক চেহারা নিয়ে গড়ে উঠতে পারত না যদি এ ধরনের যাত্রা বিবরণধর্মী রচনা পর্যটকেরা লিপিবদ্ধ না করে যেতেন। জাপান, চীন প্রভৃতি দেশেব অধিকাংশ তথ্য প্রাথমিকভাবে এই বর্ণনাগুলির মাধ্যমে পশ্চিমের জগতে পৌঁছেছিল। অতীতে লিভিংস্টোনের আফ্রিকা অভিযানের কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়। ঠিক তেমনি এভারেষ্ট অভিযান ও অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের কাহিনি যেমন জনপ্রিয় ঠিক তেমনি অজানা জায়গার তথ্য-

সমৃদ্ধ। এ ধরনের অভিযান ভৌগোলিকদের অজানা দেশের পথ চিনিয়েছে। ভূগোলকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার ক্ষেত্রে এই তথ্যমূলবাদ বা তথ্যমূলক প্রবণতার গুরুত্ব অপরিসীম।

2.5 প্রত্যক্ষবাদ

প্রত্যক্ষবাদ হল একটা বিশ্বাস বা মতবাদ। এই মতবাদের মতে বিজ্ঞানই কেবল মানুষের জীবনের সত্যতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। অর্থাৎ মানবজীবনের বাস্তব সত্যতা উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানই সফল। এই চিন্তাধারার জনক হলেন আগস্ট কোঁৎ (August Compte)। কোঁৎ বিশ্বাস করতেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সামাজিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ

১. প্রকৃতির নিয়ম মতো সামাজিক বিজ্ঞান ও নিয়ম গড়ে তোলা যায়।

২. এই নিয়মগুলির সাহায্যে ভবিষ্যদবাণী করা সম্ভব, এবং

৩. এই ভবিষ্যদবাণীগুলি বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে সমাজের প্রকৃতি বদলানো যায়।

আর জে জনসন প্রত্যক্ষবাদের আরও তিনটি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

১. বিজ্ঞানবাদ (Scienticism) — যার বক্তব্য জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষবাদই হল একমাত্র বিশুদ্ধ পদ্ধতি। অন্যান্য অ-প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতি থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা অর্থহীন, কারণ তাকে যাচাই করা যায় না।

২. বিজ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি (Scientific politics) — যার যুক্তি হল প্রত্যক্ষবাদে যেহেতু সব সমস্যারই সমাধান মেলে সেক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া উচিত।

৩. মূল্যবোধহীনতা (Valuelessness) — যার যুক্তি হলো বৈজ্ঞানিক বিচার সর্বদাই নিরপেক্ষ এবং কোনও বিশেষ নৈতিক বা রাজনৈতিক দায়িত্ব ছাড়াই বক্তব্য যাচাই করা সম্ভব।

2.6 রাশিমাত্রিক বিপ্লব (Quantitative Revolution)

১৯৬০ দশকে ভূগোলকে আরও বেশি বৈজ্ঞানিক আরও বেশি শুদ্ধ করার জন্য ব্যাপকভাবে রাশিমাত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার হয়। এই ব্যাপক হারে রাশিমাত্রিক পদ্ধতি ও মডেল ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে ভূগোলের এক আমূর্তি পরিবর্তন হয়। ইহাকেই রাশিমাত্রিক বিপ্লব হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়।

2.6.1 সূচনা

পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদের পতনের পর থেকে ভূগোলে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পরিলক্ষিত হয় তার বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুলনা করে অনেকেই মনে করতে শুরু করলেন যে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভূগোল চলছে না। অন্যান্য বিষয় যখন ব্যাখ্যামূলক ও অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করছে, ভূগোল সেখানে তাত্ত্বিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে, ভাববাদী জগতে বিরাজ করছে। এই ভূগোলবিদ্‌রা চেষ্টা করলেন ভূগোলে আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার, তত্ত্বের দিকটি সরলভাবে আবার গড়ে তোলার। এই ভাবেই শুরু হল ভূগোলে রাশিমাত্রিক বিপ্লব।

রাশিমাত্রিক বিপ্লবের ফলে ভূগোলের চরিত্রই অনেকটা বদলে গেল। ভূগোলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায়

মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে রাশিমাত্রিকের ব্যবহারের ফলে। ভূগোলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে রাশিমাত্রিকের ব্যবহারের ফলে। ভূগোল সমীক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যকে মৌলিক পরিবর্তন করে রাশিমাত্রিক বিপ্লব। ভূ-পৃষ্ঠের আঞ্চলিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে দৈশিক গঠনের মডেল নির্মাণে মনোযোগ দিলেন ভৌগোলিকরা। ভূগোলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাশিমাত্রিক বিপ্লবে ভৌগোলিকরা তাদের গবেষণায় রাশিবিজ্ঞানের নিয়মকানুন বেশি করে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। রাশিমাত্রিক বিপ্লবের ফলে ভূগোলের বৈজ্ঞানিক ভিত আরও সুদৃঢ় হল।

2.6.2 রাশিমাত্রিক বিপ্লবের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Quantitative Revolution)

রাশিমাত্রিক বিপ্লবের ফলে ভূগোলের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যার মৌলিক পরিবর্তন ঘটলেও এই বিপ্লবের অনেক সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুফলও দেখা যায়।

রাশিমাত্রিক বিপ্লবের সুফল বা গুণগুলি হল—

(i) রাশিমাত্রিক বিপ্লবের ফলে ভূগোলের বৈজ্ঞানিক ভিত আরও সুদৃঢ় হয়।

(ii) রাশিমাত্রিক বিপ্লবের ফলে ভূগোলের ব্যাখ্যা বেশি শুদ্ধ ও বোধগম্য হয়েছে।

(iii) রাশিমাত্রিকের ব্যবহারের ফলে বিশাল পরিমাণের রাশিকে ক্ষুদ্র আকারে নিয়ে যাওয়া যায়।

(iv) রাশিমাত্রিকের ব্যবহারের ফলে ভূগোলের ব্যাখ্যা ও সমীক্ষার ক্ষেত্রে ভৌগোলিকদের মধ্যে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অন্য দিকে এতগুলি সুফল থাকা সত্ত্বেও রাশিমাত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। যে সুফলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা হল—

(i) রাশিমাত্রিক বিপ্লব বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় বাস্তবকে তুলে ধরতে সমক্ষ।

(ii) দ্বিতীয়ত, মানুষের ব্যবহার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার তারতম্য, মানুষকে আশা, আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধিকে রাশিমাত্রিক বিপ্লব ব্যাখ্যা করতে পারে না। অর্থাৎ মাননীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয় রাশিমাত্রিক বিপ্লবে।

2.7 মূলক ভূগোল (Radical Geography)

মূলক ভূগোল ভূগোলেরই একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা পুরাতন চিন্তাধারাগুলিকে আমুল বদলে দেয় এবং ভূগোলের মূল বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। দৈশিক বিজ্ঞান, অবস্থানগত ব্যাখ্যাও প্রত্যক্ষবাদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলশ্রুতি হিসাবে মূলক ভূগোলের জন্ম হয়। মূলক ভূগোলের উৎপত্তি ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যে ঘোর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মূলক ভূগোলের উৎপত্তি হয়। এই বিভ্রান্তির কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভিয়েতনামের যুদ্ধ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের সামাজিক অধিকার লাভের আন্দোলন। ভিয়েতনামের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার বিরোধিতা করা শুরু করেছিল ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের এক অংশের বুদ্ধিজীবীরা। তারা আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। এই পটভূমিতেই পুরোনো চিন্তাভাবনার বৈপরীত্যগুলি তুলে ধরলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজের এক বৃহৎ অংশের মধ্যে যে সংকট-বিভ্রান্তি ও মোহমুক্তি হয়েছিল তার থেকেই মূলক

ভূগোলের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হল। মার্কিন সমাজে একদিকে ভোগের পরিমাণ ও ঝোঁক বেড়েছিল। অন্যদিকে ধর্মীয় প্রভাব। ফলে কতকগুলি ছদ্ম রাজনৈতিক চিন্তাধারা (Pseudopolitical ideologies) তীব্র সমালোচনা করে তার বাস্তব বিকল্প তুলে ধরে মূলক ভৌগোলিকরা এগিয়েছেন।

2.7.1 উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা

ভূগোলের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা প্রয়োজনীয়তা মূলক ভূগোলের প্রবক্তারা হলেন ডেভিড হার্ভে, উইলিয়াম বাংগে, রিচার্ড পিট, শ্লেটার ইত্যাদি। মূলক ভূগোলের প্রধান উদ্দেশ্য হল আর্থসামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বার করা।

2.8 সারাংশ

ভূগোল চিন্তার বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানত ভূগোলের ইতিহাসকে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ভূগোলের বিশালতা ও অনেক ভৌগোলিক ঘটনা প্রবাহের নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণের অভাবের ফলে ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশের কালক্রমানুসারে অধ্যয়ন অনেক সময় অসম্ভব। ভুগোল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান প্রবণতা দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে তথ্যমূলক প্রবণতা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আধুনিক ভূগোলের ভিতটাই এর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষবাদ ও রাশিমাত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রত্যক্ষবাদ হল এক ধরনের মতবাদ এবং রাশিমাত্রিক বিপ্লব হলো এর প্রয়োগ। বিজ্ঞানই কেবল মানুষ ও সমাজের বাস্তব সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই চিন্তা ধারাকেই প্রত্যক্ষবাদ বলে। অন্যদিকে ভূগোলকে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়ে পরিণত করতে রাশিমাত্রিকের যে ব্যাপক ব্যবহার তাকে রাশিমাত্রিক বিপ্লব বলে। অন্যদিকে মূলক ভূগোল হল ভূগোলে পুরোনো চিন্তাধারার অবস্থান ঘটিয়ে সমাজের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বার করার চেষ্টা ভূগোলের যে শাখায় করা হয় তাকে মূলক ভূগোল বলে।

2.9 প্রশ্নাবলি

1. ভৌগোলিক চিন্তার বিকাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
2. তথ্যমূলবাদ বলিত কী বোঝায়?
3. প্রত্যক্ষবাদ কী?
4. রাশিমাত্রিক বিপ্লবের সুফলগুলি উল্লেখ করুন।
5. মূলক ভূগোলের উদ্দেশ্য কী?

2.10 উত্তরমালা

1. উত্তরের জন্য 2.2 অংশ দেখুন।
2. উত্তরের জন্য 2.4 অংশ দেখুন।
3. উত্তরের জন্য 2.5 অংশ দেখুন।
4. উত্তরের জন্য 2.6.1 অংশ দেখুন।
5. উত্তরের জন্য 2.7.1 অংশ দেখুন।

একক 3 ❐ ভৌগোলিক চিন্তাধারা : নির্ধারণবাদ, সম্ভাবনাবাদ, সবয়ববাদ, বস্তুবাদ

গঠন

3.1 নির্ধারণবাদ (Determinism)

3.2 সম্ভাবনাবাদ (Possibilism)

3.3 সবয়ববাদ (Structuralism)

3.4 বস্তুবাদ (Materialism)

3.5 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

3.1 নির্ধারণবাদ (Determinism)

ভূগোলের এক প্রাচীনতম এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত চিন্তাধারা হইল 'নির্ধারণবাদ' বা 'পরিবেশগত নির্ধারণবাদ (Environmental Determinism)। এই দর্শনের অনুগামীদের মতে, মানুষের কার্যাবলীর প্রাথমিক নির্ধারক হইল তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ। কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা জাতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি জীবনধারা ও উন্নতির পর্যায় প্রধানত অথবা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে অপরপক্ষে মানুষ হইল এক নিষ্ক্রিয় উপাদান যাহার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ কার্যরত রহিয়াছে, এবং মানুষের মনোভাব সিদ্ধান্ত ও জীবনযাত্রার ধরনকে নির্ধারিত করিতেছে। যে দর্শন, উপস্থাপনা এবং পদ্ধতিতে মানুষ ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ব্যাখ্যা করা হয় তাহাকে পরিবেশবাদ (Environmentalism) বলা হইয়া থাকে। নির্ধারণবাদী মতবাদের সূচনা প্রাচীন যুগে হইলেও বর্তমানেও উহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ভৌগোলিক চিন্তাধারা রূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

নির্ধারণবাদের উদ্ভব : প্রাচীনযুগের গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতগণ সর্বপ্রথম নির্ধারণবাদী দর্শনকে প্রচার করেন। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য চরিত্র ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যের কারণকে তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্যের বিচারে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস হইতেই এই সকল পণ্ডিত নির্ধারণবাদী দর্শনের সৃষ্টি করেন। থ্সিদিদাস্ এথেন্সের এবং স্ট্র্যাবো রোমের মহত্বের কারণ রূপে উহাদের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করেন। অ্যারিস্টটল্ উত্তর ইউরোপ এবং এশিয়ার অধিবাসীগণের মধ্যে মানসিক গুণাগুণের পার্থক্যের কারণ সমূহ এই সকল অঞ্চলের স্থানীয় জলবায়ুগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি পৃথিবীর বাসযোগ্য ও বসবাসের অযোগ্য বলয়সমূহকে জলবায়ুগত অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেন। পরে এরাটোস্থেনিস্ ও স্ট্র্যাবো ভূ-পৃষ্ঠের বাসযোগ্য বলয় সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণাকে সমর্থন করেন এবং উহাকে কিছুটা পরিবর্তন করেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির রচনাবলিতে ভূ-পৃষ্ঠের বাসযোগ্য বলয়গুলি সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের নির্ধারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কিন্তু টলেমির মৃত্যুর সহিত গ্রিক পণ্ডিতগণের নির্ধারণবাদী দর্শনের সমৃদ্ধি ভাবধারাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মধ্যযুগে নির্ধারণবাদ : ইউরোপের 'অন্ধকার যুগে' ভৌগোলিক চিন্তাধারায় বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই। এই যুগের

ভূগোলবিদ্‌গণ প্রধানত প্রাচীন গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতদের ভৌগোলিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। গির্জার যাজকদের ধারণার বিরুদ্ধবাদী কোনো নতুন মতবাদকে তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অ্যারিস্টটলের নির্ধারণবাদী ধারণার সমর্থন প্রথম মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় পণ্ডিত Albertus Magnus স্থানের প্রকৃতি বিষয়ক একটি পুস্তক রচনা করেন। মধ্যযুগে বাসযোগ্য বলয় ও অক্ষাংশের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক গ্রিক তত্ত্বটি মধ্যযুগের ইউরোপীয় ভূগোলবিদ্‌গণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। Aenes Silvius এবং Cardinal Pierred Ailly তাঁহাদের রচনায় "জলবায়ুগত নির্ধারণবাদ" সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মধ্যযুগে আরব পণ্ডিতগণের ভৌগোলিক চিন্তাধারায় পরিবেশগত নির্ধারণবাদ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সল্‌ বাত্তানি, সল্‌ মাসুদি ইবন হাকল প্রভৃতি বিখ্যাত আরব ভূগোলবিদ্‌ তাঁহাদের রচনায় মানুষের কার্যাবলী ও জীবনযাপন প্রণালীর সহিত তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেন। তাঁহারা পৃথিবীর বাসযোগ্য অংশকে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি 'কিশচয়ার' বা অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া ওই সকল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ প্রদান করেন। আল্‌ বিরুণী তাঁর ভারতবর্ষ বিষয়ক পুস্তকে হিন্দু সংস্কৃতির উপর মৌসুমীবায়ুর প্রভাব বর্ণনা করেন। সম্ভবত ইবন্‌ খালদুন হইলেন প্রথম ভূগোলবিদ্‌, যিনি মানুষ পরিবেশ সম্পর্ককে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। খালদুন তাঁর রচনায় প্রাচীন জলবায়ুগত নির্ধারণবাদের ব্যাখ্যা করেন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির উপর উহার প্রভাবের বিবরণ দেন।

রেনেশাঁস ও নির্ধারণবাদ : ১৫শো শতাব্দীর সূচনা হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল আবিষ্কার, অনুসন্ধান, অভিযান ও সমুদ্রযাত্রা হইতে পরিবেশগত নির্ধারণবাদের স্বপক্ষে নানা তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করা হইতে থাকে। উহাদের ভিত্তি করিয়া রেনেশাঁস যুগের পশ্চিম ইউরোপীয় ভূগোলবিদ্‌গণ নির্ধারণবাদী দর্শনকে উৎসাহের সহিত নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। Cluverius তাঁর রচনায় বাসযোগ্য অঞ্চল বিষয়ক ধারণার উল্লেখ করেন এবং Nathaniel Carpenter মানব চরিত্রের উপর জলবায়ুর প্রভাবের বিভিন্ন উদাহরণ উপস্থাপিত করেন।

১৮শো শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসি রাজনৈতিক দার্শনিক এবং নির্ধারণবাদী মনীষী মন্টেস্কু মানুষের রাজনৈতিক চরিত্রের উপর জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাব বর্ণনা করেন। তবে, মানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির ভূমিকাকেও অস্বীকার করেন নাই। ইমানুয়েল কান্ট মনে করেন যে, প্রকৃতিকে মুখ্য নির্ধারক এবং মানুষকে উহার সহকারী বলিয়া গণ্য করলে ভৌগোলিক ধারণার সমন্বয় সাধন সঠিকবাবে করা সম্ভব হয় না। তবে, নিউ হল্যাণ্ড উপকূলের অধিবাসীদের উপর স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করিবার সময় তিনি পরিবেশগত নির্ধারণবাদী ধারণাকে স্বীকার করেন। August Zenue সকল প্রাকৃতিক ও জৈবিক উপাদানের অসামান্য পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক অঞ্চলের সংজ্ঞা নির্ধারণের সময় পরিবেশগত নির্ধারণবাদী দর্শন প্রচার করেন।

১৯শো শতাব্দীতে নির্ধারণবাদ ঃ ১৯শো শতকের ভূগোলবিদ্‌গণ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণের সহায়তায় নির্ধারণবাদী দর্শনের নীতি নির্ধারণ এবং উহাদের পরীক্ষা করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এই শতকের প্রথমভাগে Alexander Von Humboldt এবং Carl Ritter নির্ধারণবাদী দর্শনের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেন। 'উদ্দেশ্যবাদী' (telcological) দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে Ritter মনে করেন যে, মানুষের নিকট পৃথিবী হইল একটি শিক্ষামূলক আদর্শ। এখানে প্রকৃতির এক ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে যাহা মানুষকে উন্নতির পথ প্রদর্শন করায়। এক সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ককে পরীক্ষা করেন। তিনি প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক অঞ্চলের ধারণায় মানুষ ও তাহার পরিবেশকে গ্রহণ করিলেও মানুষকে প্রাথমিক নির্ধারকরূপে গণ্য করেন নাই।

Charles Darwin তাঁর প্রজাতির বিবর্তন বিষয়ক তত্ত্ব প্রকাশ করিবার পরে উহা ১৯শো শতাব্দীর নির্ধারণবাদী

ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জীব সমূহ এবং তাহাদের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ডারউইন তিনটি মূল ধারণাকে উপস্থাপিত করেন, যেমন— (i) সময়ের অগ্রগতির সহিত বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তন বা বিবর্তন, (ii) জীবন সমূহের 'সমাহারের' উদ্ভব এবং (iii) অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগ্রাম বা 'স্বাভাবিক নির্বাচন'।

ডারউইনের দর্শন ও পদ্ধতির ভিত্তিতে Ratzel মানবীয় ভূগোলে এক রীতিবদ্ধ আলোচনার সূচনা করেন। তাঁহার মতে, মানব সংস্কৃতির বিভিন্নরূপ প্রাকৃতি অবস্থার প্রভাবেই নির্ধারিত এবং গৃহীত হইয়াছে। Buckle ইতিহাসের আলোচনায় পরিবেশবাদী ধারণাকে ব্যবহার করেন। তাঁহার মনে, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা মৃত্তিকার উর্বরতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতা জলবায়ুর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীতে নির্ধারণবাদ : বিংশ শতাব্দীর সূচনায় W. M. Davis-এর তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ধারণাগুলি মূলত ডারউইনের 'স্বাভাবিক নির্বাচন ও অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম' তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নির্ধারণবাদী Miss Ellen Semple বলেন যে, মানুষ হইল ভূ-পৃষ্ঠের ফলস্বরূপ। তিনি জাতির এবং মানুষের মানসিক অবস্থার উপর জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করেন। Hintington এবং Dexter স্বীকার করেন যে, মানুষের জীবনধারার অন্যতম মুখ্য নিয়ন্ত্রক হইল জলবায়ুগত অবস্থা। Brighan তাঁহার রচনায় নির্ধারণবাদী দর্শনের সমালোচনা করেন। তিনি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলবায়ুকে একটি সাধারণ নির্ধারক বলিয়া গণ্য করেন নাই। আমেরিকার বহু বিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের তত্ত্বের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু H. J. Mackinder এবং অন্য অনেক পণ্ডিত ডারউইনের ''সংগ্রাম ও নির্বাচন'' বিষয়ক ধারণাকে সমর্থন এবং উহার প্রচার করিতে থাকেন। রাশিয়ার ভূগোলবিদ্গণ পরিবেশবাদকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করিলেও মার্কসীয় ভূগোলে মানুষের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সমালোচনা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ভূগোলবিদ্গণ এবং বিশেষভাবে পশ্চিমী দেশের ভূগোলবিদ্গণ পরিবেশগত নির্ধারণবাদের ধারণাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। সমালোচকগণ মনে করেন যে, নির্ধারণবাদীরা ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষেত্রে এক পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার প্রকৃতির সক্রিয় ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন এবং মানুষকে এমন এক নিষ্ক্রিয় উপাদানরূপে গণ্য করিয়াছেন যাহা সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবীয় কার্যাবলী এমন বহু বাস্তব অবস্থাকে উপস্থাপিত করে যাহাদের একমাত্র প্রাকৃতিক সক্তির ভিত্তিতে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। অনেক ভূগোলবিদের মতে, পরিবেশগত নির্ধারণবাদ একটি অতি-সরলীকৃত ধারণা। কারণ উহাতে মানুষের আচরণকে নির্দ্ধারণকারী সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে বর্জন করা হইয়াছে। এছাড়া এই ধারণাটি সর্বজনগ্রাহ্য নহে, এবং উহাকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা যায় না। নির্দ্ধারণবাদীগণের উপস্থাপনাকে সমালোচনা করিয়া Spate বলেন যে, ''পরিবেশকে'' শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিলে উহা অর্থহীন হয়, কারণ মানুষ ছাড়া পরিবেশের অস্তিত্ব থাকে না। তাঁহার মতে, স্থানানুসারী পৃথকীকরণের একটি অন্যতম উপাদান হইল ভৌগোলিক পরিবেশ এবং উহা সমাজের মাধ্যমে কার্যরত রহিয়াছে, এবং উহা মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। Hartshorne পরিবেশবাদের ধারণকে গ্রহণ করেন নাই। কারণ উহা প্রকৃতি ও মানুষকে পৃথক করে এবং এজন্য ভূগোল শাস্ত্রকে একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় না।

নির্ধারণবাদ হইল ভূগোল শাস্ত্র বিষয়ক একটি প্রাচীনতম এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত চিন্তাধারা। মধ্যযুগের প্রথমভাগে ভূগোলবিদ্গণ অভিযান যুগের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং তথ্য সংগ্রহ করেন। উহাদের সহায়তায় 'রেনেশাঁস

যুগে' তাঁহার নির্ধারণবাদী দর্শকের বৈধ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। ডারউইনের তত্ত্ব প্রচলিত হইবার পরে ১৯শো শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ধারণবাদী দর্শন এক সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। কিন্তু উন্নত সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ তাহাদের বস্তুবাদী সংস্কৃতি ও ক্ষমতা এবং পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক সচেতনতার কারণে নির্ধারণবাদী দর্শনের ব্যবহারকে অত্যধিক প্রবণতাকে সমর্থন করেন নাই, এবং এই মতাবাদের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

নব্য-নির্ধারণবাদ (Neo-determinism) : ১৯৪০-এর দশকে ভূগোলবিদ্ Griffith Taylor সর্বপ্রথম নব্য-নির্ধারণবাদের ধারণা প্রচার করেন। এই ধারণাটি 'Stop-and-go' নির্ধারণবাদ নামেও পরিচিত। Taylor মনে করেন যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সর্বোত্তম উপায় মূলত প্রাকৃতিক দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে এবং ভূগোলবিদ্গণ শুধুমাত্র এই উপায়কে ব্যাখ্যা করেন। কোনো দেশের উন্নয়নকে মানুষ দ্রুততর বা ধীরগতি অথবা বন্ধ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষের কখনই পরিবেশ নির্ধারিত পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবীয় কার্যাবলীর ধরণকে নির্ধারিত করে, এবং প্রকৃতির মধ্যে শুধুমাত্র 'সম্ভব' ও 'অসম্ভব' রহিয়াছে। নির্ধারণবাদীগণের মতে একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেশ যে সকল সম্ভাবনাকে উপস্থাপিত করে উহারা একই ধরনের অথবা অসীম হয় না। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্ভাবনাসমূহ হইতে মানুষ শুধুমাত্র কিছু সম্ভাবনাকে নির্বাচিত করিয়া থাকে।

নব্য-নির্ধারণবাদী ধারণাকে সমালোচনা করিয়া Tatham বলিয়াছেন যে, 'Stop-and-go' নির্ধারণবাদে মানুষকে একটি স্বাধীন উপাদানরূপে গণ্য করা হয় না। কিন্তু কোনোরূপ বিকল্প কার্যাবলীর ধারণাকে স্বীকার করিলে মানুষকে একটি স্বাধীন উপাদান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কোনো পরিবেশই অসীম সম্ভাবনাকে উপস্থাপিত করে না, এবং প্রত্যেক নির্বাচনের জন্যই কিছু মূল্য প্রদান করিতে হয়। তবে এইরূপ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে। মানুষ তাহার নির্বাচনকে নির্ধারিত করে, এবং তাহার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কার্যাবলীর যথার্থতা বিচার করে। প্রাচীন ও নব্য নির্ধারণবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ নব্য-নির্ধারণবাদে নির্বাচনের ধারণাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহাতে মনে করা হয় যে, কোনো উদ্দেশ্যসাধনের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচনকে নির্ধারিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নির্ধারণবাদ (Cultural and Social determinism) : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূগোলবিদ্গণের প্রচারিত এই ধারণায় মানবিক উপাদনের এবং বিশেষভাবে মানুষের সংস্কৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। এই ধারণা অনুসারে মানুষের আগ্রহ ইচ্ছা, বিধিনিষেধ এবং গোষ্ঠীগত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্থানানুসারী তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো পরিবেশের পরিবর্তন মানুষের উপলব্ধি, ধারণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এজন্য মানুষের নিকট তাহার আবাসভূমির অজৈব ও জৈব বৈশিষ্ট্য সমূহের গুরুত্ব তাহার মনোভাব, উদ্দেশ্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রযুক্তির উন্নতির সহিত পরিবেশের গুরুত্ব হ্রাস পায় না এবং উহা পরিবর্তিত ও জটিলতর হইতে থাকে। Edward Ullman মনে করেন যে, পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ এবং উহার ভূমিকা একটি পরিবর্তনশীল সমাজের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পর্যায়, সংস্কৃতির ধরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। একই ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন ধরণের মানবিক প্রতিক্রিয়ার সষ্টি হইতে পারে। অপরপক্ষে একই ধরণের প্রাকৃতিক অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব। সাংস্কৃতিক-ভৌগোলিক পার্থক্য সমূহের উপর পরিবেশের উপাদানগুলির প্রভাবকে সাংস্কৃতিক নির্দ্ধারণবাদে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় না, এবং এই মতবাদটি পরিবেশগত নির্ধারণবাদের মতই সীমাবদ্ধ। এজন্য এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে।

3.2 সম্ভাবনাবাদ (Possibilism)

সম্ভাবনাবাদী দর্শনে মানুষ ও তাহার পরিবেশের সম্পর্ককে যে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে উহাকে প্রায়শঃই নির্ধারণবাদের এক বিকল্প তত্ত্বরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। নির্ধারণবাদীগণের মনে, মানুষ হইল এক নিষ্ক্রিয় উপাদান এবং পরিবেশ হইল তাহার মূল নির্ধারক। কিন্তু সম্ভাবনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মনে করা হয় যে, মানুষ হইল একটি সক্রিয় উপাদান এবং সে তাহার পরিবেশকে পরিবর্তিত করিতে ও পরিবেশের সম্ভাবনা সমূহকে ব্যবহার করিতে সক্ষম। সম্ভাবনাবাদী দর্শন অনুসারে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে নির্বাচন করিবার সুযোগ দেয় এবং একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সহিত নির্বাচনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইভাবে সম্ভাবনাবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় সাংস্কৃতিকে একটি সক্রিয় শক্তিরূপে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসি ঐতিহাসিক Lucian Febvre বিভিন্ন সমাজের উন্নতির পর্যায় এবং ইতিহাসকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদানের এই নূতন ধারাকে তিনি ‘সম্ভাবনাবাদ’ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

সম্ভাবনাবাদের উদ্ভব : প্রাচীন যুগের বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্ল্যাটো সর্বপ্রথম সম্ভাবনাবাদী ধারণা প্রচার করেন। তিনি মানুষকে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনকারী রূপে চিহ্নিত করেন। মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে প্ল্যাটোর ধারণা সম্ভাবনাবাদের প্রায় অনুরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে এই চিন্তাধারার অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যায়। ১৮শো শতাব্দীর বিখ্যাত রাজনৈতিক দার্শনিক মন্টেস্কু নির্ধারণবাদের বিকল্পরূপে সম্ভাবনাবাদের উপর কিছুটা আলোকপাত করেন। তাঁহার মতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে এবং সে বহু গ্রহণযোগ্য পথ হইতে কিছু বিশেষ পথকে নির্বাচন করিতে সক্ষম হয়। অপর এক ফরাসি পণ্ডিত বিশ্বাস করিতেন যে মানুষ বিশ্বকে জয় করিবার আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার সভ্যতা বিকাশের প্রক্রিয়ার ভূ-পৃষ্ঠকে রূপান্তরিত করিয়াছে। ১৮শো শতকের অধিকাংশ পণ্ডিত নির্দ্ধারণবাদী এবং ডারউইনের দর্শনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করিবার ফলে এই সময় সম্ভাবনাবাদের বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই।

১৯শো শতাব্দীর সম্ভাবনাবাদ : ১৯শো শতাব্দীর অধিকাংশ ভূগোলবিদ্ প্রধানত নির্ধারণবাদী দর্শনকে ব্যাখ্যা ও উহার বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করিলেও অনেকে একটি বিকল্প ধারণা নির্মাণের চেষ্টা করেন। আমেরিকান পণ্ডিত George Marsh মানবীয় কার্যাবলীর মাধ্যমে আবাসভূমির পরিবর্তনের বিবরণ প্রদান করেন। জার্মানির ভূগোলবিদ্ Alfred Kirchhoff প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানবসমাজ সমূহকে পর্যবেক্ষণ করিবার সময় মানব গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

Vidal de la Blache সর্বপ্রথম সম্ভাবনাবাদের ধারণাভিত্তিক অবয়ব নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক Lucien Febvre উহার সার্বিক উন্নতি করেন। Vidal তার গবেষণার মানুষের কার্যকলাপে পরিবেশের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। তাঁহার মতে, বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে মানুষের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য হইল তাহাদের সভ্যতার ফলস্বরূপ ও প্রতিফলন এবং এই সভ্যতা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে মানুষের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি একই বা একই ধরনের পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের ফলে এইরূপ তারতম্যের সৃষ্টি হয় না। তাঁহার মতে এইরূপ তারতম্যের প্রধান কারণ হইল মানুষের মূল্যবোধ, মনোভাব ও আবাসভূমির পার্থক্য। Vidal-এর গবেষণা সম্ভাবনাবাদকে এই সুদৃঢ় দার্শনিক এবং পদ্ধতিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীতে সম্ভাবনাবাদ : Vidal de la Blache তাঁর সম্ভাবনাবাদী দর্শনকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ

পর্যন্ত প্রচার করেন এবং তাঁহার চিন্তাধারা আধুনিক ভূগোলবিদ্গণের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয় Jean Brunhes ফ্রান্স এবং অন্য অনেক ইউরোপীয় দেশে Vidal-এর মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, প্রাকৃতিক উপাদান সমূহ মানুষের কার্যাবলীর কিছু সীমা নির্ধারিত করিয়াছে এবং মানুষ উহাদের কিছুটা পরিবর্তিত করিতে সক্ষম হয়। কিছু সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মানবীয় কার্যাবলীর তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু মানুষ পরিবেশ-নির্দিষ্ট সীমাতে অতিক্রম করতে পারে না। Lucien Febver মানুষকে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় শক্তিরূপে গণ্য করেন। তাঁহার মতে, মানুষ হইল ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান। আমেরিকার ভূগোলবিদ্ Isaiah Bowman বলেন যে, প্রাকৃতিক নীতিসমূহের প্রকৃতি ও প্রভাবের মাত্রার তারতম্য হওয়া সম্ভব, কিন্তু সকল অঞ্চলের সকল মানুষই প্রাকৃতির অবস্থার মাধ্যমে কিছুটা প্রভাবিত হইয়া থাকে। Carl Sauer বলিয়াছেন যে, মানুষ তাহার সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আচরণ করে, তাহার স্বাভাবিক পরিবেশের প্রাকৃতিক ও জৈবিক উপাদান সমূহকে ব্যবহার করে এবং তাহাদের এক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। Derwent Whittlesey সম্ভাবনাবাদী দর্শনে একটি অনুক্রমিক অধিকার (sequent occupance) ধারণার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই ধারণায় মনে করা হয় যে, কোনো অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার ধরনের কোনোরূপ পরিবর্তন হইলে সমাজের সম্পদ-ভিত্তির তাৎপর্যকে পূণর্মূল্যায়ণ করিবার প্রয়োজন হয়। অনুক্রমিক অধিকারের ধারণায় প্রত্যেক পার্থিব সংস্কৃতি তাহার অঞ্চলকে নিজস্ব পদ্ধতিতে কিভাবে ব্যবহার করিতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করা হয়। মানুষের সাংস্কৃতিক ভূ-চিত্র সৃষ্টির পর্যায় সমূহকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতির উদ্ভব হয়। এইরূপ একটি নীতি অনুসারে পরিবেশ সম্পর্কে মনোভাব, উহাকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার তারতম্যের কারণে একই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জমি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্থবহ হইতে পারে।

অনেক রাশিয়ান ভূগোলবিদ 'পরিবেশগত নির্ধারণবাদের' এক বিপরীত ধারণা রূপে তাঁহাদের ''ধারণা ভিত্তিক সম্ভাবনাবাদী দর্শন'' মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। মার্কসীয় ভূগোলের বিশেষজ্ঞ Pokrovskiy মনে করেন যে, মানুষ প্রকৃতিকে শাসন করিতে সক্ষম বলিয়া প্রকৃতি তাহার অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তি হইতে পারে না। অপরপক্ষে, প্রকৃতি হইল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর একটি উপাদান মাত্র এবং মানুষের শ্রম হইল তাহার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ভূগোলবিদ্ Voskanyan-এর মতে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম এবং প্রকৃতির মুখ্য নিয়ন্ত্রক।

সমালোচনা : বহু আধুনিক ভূগোলবিদ সম্ভাবনাবাদী দর্শনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। Griffith Taylor মনে করেন যে, ভূগোলের মূল উদ্দেশ্য হইল প্রাকৃতিক পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ এবং মানুষের উপর উহার প্রভাব বিশ্লেষণ। মানুষ বা তাহার সাংস্কৃতিক ভূ-চিত্রের সকল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ভূগোলবিদ্গণের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু সম্ভাবনাবাদ ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করে না এবং ভূগোলে মানুষ-কেন্দ্রীক আলোচনাকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপরপক্ষে নির্ধারণবাদী দর্শন ভূগোলবিদ্গণের দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে চালিত করিয়া ভূগোলের মূল উদ্দেশ্যকে সংরক্ষণ করে। সম্ভাবনাবাদী দর্শনে মানুষকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকরূপে এবং প্রকৃতিকে মানুষের পরামর্শদাতা বলিয়া গণ্য করা হয়। সম্ভাবনাবাদীদের মতে, প্রকৃতিতে সর্বত্রই সম্ভবনা দেখা যায় এবং কোথাও প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রত্যেক অঞ্চলেই সম্ভাবনার মাত্রা পরিবেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। মানুষ তাহার চাহিদা পূরণের জন্য যে মূল্য প্রদানে প্রস্তুত উহার উপরেই সম্ভাবনার মাত্রা নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃতি মানুষের কার্যাবলীর কিছু সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে যাহাতে মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াই মানুষ তাহার ক্ষমতা অনুসারে নিজের ভৌগোলিক আবাসভূমিকে ব্যবহার করে এবং উহার ভৌগোলিক সম্ভাবনাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। মানবীয় কার্যাবলীর এই প্রকৃতি নির্ধারিত সীমা সময় ও স্থান অনুসারে পরিবর্তিত হয়। প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী অথবা অনগ্রসর সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের নিকট নির্বাচনের সুয়োগ ন্যূনতম হয়। অপরপক্ষে

অনুকূল পরিবেশে বসবাসকারী অথবা উন্নত সংস্কৃতির মানুষ তাহার পরিবেশের অসংখ্য সম্ভাবনাকে উপভোগ করতে সক্ষম হয়।

3.3 অবয়ববাদ (Structuralism)

সামাজিক ভূগোলের বিভিন্ন আলোচ্য-বিষয় বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূণও দার্শনিক আদর্শ হইল 'অবয়ববাদ'। এই দর্শনে এমন কিছু নীতি এবং পদ্ধতির উপস্থাপনা করা হয় যাহারা সক্রিয় মানবিক বিষয়ের দৃষ্টিগোচর ও সচেতন বিন্যাসের গভীরে পর্যবেক্ষণ করিয়া কিছু অপরিহার্য যুক্তি নির্ধারণ করে। এই যুক্তি মানুষ ওই সকল বিন্যাসকে তাহাদের মৌলিক ও স্থায়ী অবয়বের ভিত্তিতে আবদ্ধ রাখে, এবং এইরূপ অবয়বকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-নির্ভর কার্যাবলীর মাধ্যমে উন্মোচিত করা সম্ভব হয়। অবয়ববাদী দর্শনের এক প্রাচীনতর রূপ হইল 'বাস্তববাদী অবয়ববাদ' (Realist Structuralism)। এই দর্শন অনুসারে একটি গঠন বা অবয়ব হইল কিছু সম্পর্ক ভিত্তিক প্রক্রিয়ার সমাহার, এবং এইরূপ প্রক্রিয়াগুলি হইল পর্যবেক্ষণের উপযোগী সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ-সচেতনতার ভিত্তি এবং উহাদের বর্ণনা প্রদানকারী।

অবয়ববাদের বিকাশ : প্রাচীন যুগের বিখ্যাত মনীষী প্ল্যাটো এবং অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারায় অবয়ববাদী বিশ্লেষণের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সময় হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত অবয়ববাদী ধারণা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটনের চিন্তাধারাতে নানারূপ অবয়ববাদী ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯শো শতাব্দীতে বহু ফরাসি ও জার্মান সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক অবয়ববাদী দর্শনের সূচনা হয়। Auguste Comte সর্বপ্রথম ফ্রান্সে পদ্ধতিগতভাবে অবয়ববাদী ধারণা প্রচার করেন। ফরাসি বিপ্লবের পরে দৃষ্টবাদী দর্শন (Positivism) প্রচার করিবার সময় Comte অবয়ববাদ বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারাকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দৃষ্টিগোচর বিষয়সমূহের অবস্থাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ এবং অনুক্রম ও সাদৃশ্যের স্বাভাবিক সম্পর্কের মাধ্যমে উহাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস হইতেই Comte তাঁর অবয়ববাদী ধারণা সমূহকে সংগঠিত করেন। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী Durkheim সমাজ-ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণের সময় তাঁহার অবয়ববাদী ধারণাকে প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে, সকল দৃশ্যমান সামাজিক বিষয়কেই অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। দৃশ্যমান বিষয়সমূহকে তাহাদের অন্তর্নিহিত নৈমিত্তিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করিবার এই প্রচেষ্টা অবয়ববাদী বিশ্লেষণের এক নব-দিগন্তের সূচনা করে। জার্মানিতে মূলত Hegel-এর সামগ্রিকতা বিষয়ক ধারণাকে ভিত্তি করিয়া অবয়ববাদী দর্শনের সূচনা হইয়াছিল। Hegel মনে করেন যে, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যে এক সামগ্রিক ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগে কিছু সুনির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহ অবয়ববাদী দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে। পরবর্তীকালে Hegel-এর অবয়ববাদী ধারণাসমূহ মার্কসকে তাঁহার দর্শন প্রচারে উৎসাহিত করে। Rumley তাঁর রচনায় মার্কস-পূর্ব পর্যায়ের অবয়ববাদী চিন্তাধারার কিছু ভৌগোলিক উদাহরণ উপস্থাপিত করেন। তিনি 'স্থানের' তুলনামূলকভাবে স্বাধীন প্রভাবসমূহকে চিহ্নিত করিবার জন্য সামাজিক কার্যাবলীর দৃশ্যমান বিন্যাসের গভীরে অনুসন্ধান করেন। তাঁহার মতে, 'অবয়বের প্রভাবের' অর্থ হইল সামাজিক গোষ্ঠীগুলির স্থান-ভিত্তিক সমাবেশের কারণে মানুষের মনোভাব ও আচরণের নবজাগরণ। এইরূপ প্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ তিনি Robin এবং Foladore-এর গবেষণার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। Robin-এর গবেষণা অনুসারে, শিক্ষার বিষয়ে মনোভাব উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বাসস্থানগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে Foladore আবিষ্কার করেন যে, একই ধরনের উপজীবিকায় নিযুক্ত সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের স্থান-ভিত্তিক সমাবেশ মানুষের ভোটদান বিষয়ক মনোভাবকে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

Levi-Strauss এবং অবয়ববাদী নৃতত্ত্ব : বিখ্যাত ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ Levi-Strauss সর্বপ্রথম আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় অবয়ববাদী বিশ্লেষণকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অবয়ববাদী দর্শনের মূল ধারণাগুলিকে প্রাথমিকভাবে ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। Levi-Strauss অবয়ববাদী ধারণা ভূগোলের আলোচনা-ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করেন।

ভাষাতাত্ত্বিক অবয়ববাদের আলোচনা ক্ষেত্রে F. Saussure লক্ষ্য করেন যে, স্বাভাবিক ভাষাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের নিয়মের কিছু মূলগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। এছাড়া তিনি ভাষার 'প্রাথমিক কণা' সমূহকেও আবিষ্কার করেন। Levi-Strauss তাঁহার পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এই সকল ধারণাকে প্রয়োগ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, পারিবারিক সম্পর্কের 'প্রাথমিক গঠনগুলি' হইল এমন কিছু ব্যবস্থা যাহা কিছু সুনির্দিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহকে অনুমোদন করে, অর্থাৎ উহারা সমাজের সকল সদস্যকে দুটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করে, যেমন— সম্ভাব্য স্বামী ও স্ত্রী এবং নিষিদ্ধ স্বামী ও স্ত্রী। Levi-Strauss প্রবর্তিত অবয়ববাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি মানবসমাজের এক তাত্ত্বিক আদর্শ নির্মাণের সহায়ক হইলেও উহা কোনো দৃশ্যমান বাস্তব অবস্থার অনুরূপ না হইতেও পারে।

অবয়ববাদী মার্কসবাদী (Structural Marxism) : মার্কসীয় ভূগোলে অবয়ববাদের যে বিশেষ রূপকে প্রচার করা হইয়াছে উহা 'অবয়ববাদী মার্কসবাদ' নামে পরিচিত। বিখ্যাত জার্মান রাজনৈতিক দার্শনিক কার্ল মার্কস মূলত হেগেলের অবয়ববাদী দর্শন হইতে তাঁর অবয়ববাদের ধারণাকে গ্রহণ করেন। অবয়ববাদী মার্কসবাদের অনুগামীরা মনে করেন যে, বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল নহে এবং তাঁহারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের স্থানানুসারী সংগঠনকে। সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাতকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু মার্কসীয় ধারণা অনুসারে, 'শ্রম' হইল এমন একটি 'পদ্ধতি' যাহার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত নিজেদের এবং তাহাদের সমাজকে পরিবর্তিত করিয়া থাকে। এইরূপ পরিবর্তনের প্রভাবে শ্রমের ও উৎপাদনের উন্নয়নের স্তরসমূহের উদ্ভব হয়, এবং উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট ধরন ও উহার প্রভাবে সৃষ্ট সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এই স্তরসমূহ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই সকল স্তরের মধ্য দিয়া মানবসমাজ এক প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর অবস্থা হইতে ক্রমশঃ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকে পরিণত হইয়া থাকে। অবয়ববাদী মার্কসবাদের ধারণা অনুসারে, যে সকল সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সমাজ-ব্যবস্থা অবিরামভাবে গঠিত ও পূণর্গঠিত হইতেছে সেগুলি এক সামগ্রিকতার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে এবং উহারা 'সমগ্রের কোনো একক অংশের' মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না।

ফরাসি 'অবয়ববাদ' এবং জার্মান 'মার্কসবাদের' সমন্বয়ে অবয়ববাদী মার্কসবাদের উদ্ভব হইয়াছে। এই দর্শনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যেমন— (i) এই দর্শন 'প্রয়োগবাদ বিরোধী', কারণ উহাতে মনে করা হয় যে, দৃশ্যমান অবস্থাসমূহ বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করে না, অভিজ্ঞতাকে বিশ্বাস করা যায় না, এবং পর্যবেক্ষণের উপযোগী তথ্যসমূহ এমন অন্তর্নিহিত বাস্তব অবস্থা হইতে সৃষ্ট হয় যাহাকে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার সাহায্যে অনুমান করিতে হয়, (ii) এই দর্শন 'ইতিহাসবাদ বিরোধী', কারণ ইতিহাস-ভিত্তিক বিশ্লেষণের যে কোনো প্রচেষ্টাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসারী হয় না এবং উহা মূলত উদ্দেশ্যবাদী ধারণা ভিত্তিক হইয়া থাকে, (iii) এই দর্শন 'মানবতাবাদ বিরোধী', কারণ উহাতে মানবীয় বা সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না।

Bodelier মনে করেন যে, মার্কসবাদ হইল 'অবয়ববাদের' এক বিশেষ রূপ। এই মতবাদের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যেমন— (i) উহা দৃশ্যমান বাস্তব অবস্থা-ভিত্তিক বিজ্ঞান নহে, উহা হইল দৃশ্যমান মানবীয় সম্পর্কের অন্তর্নিহিত অবয়বের এক যুক্তি নির্ভর বিজ্ঞান, এবং (ii) উহাতে সক্রিয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের উপর তাহাদের অন্তর্নিহিত অবয়বের অসম প্রভাবকে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে Frankfurt Institute of Social Research নামক এক সংস্থার অনেক গবেষক অবয়ববাদী মার্কসবাদের ধারণায় পূর্ণমুল্যায়ণ করেন এবং

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে গবেষণার মাধ্যমে এই মতবাদকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। অবয়ববাদে কোনো দৃশ্যমান বাস্তব অবস্থার অন্তর্নিহিত অবয়ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে। এই মতবাদ অনুসারে ঐ অবয়বসমূহ মানুষের চিন্তাধারা, বিষয়-ভিত্তিক অর্থবোধ এবং কার্যাবলিকে নির্ধারিত করে। মানবতাবাদ হইতে অবয়ববাদে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন মানুষকে একটি 'বিষয়' হইতে 'উদ্দেশ্য' এবং এক 'নির্ধারক' হইতে 'নির্ধারিত' উপাদানে রূপান্তরিত করিয়াছে।

3.4 বস্তুবাদ (Materialism)

বস্তুবাদ বা জড়বাদ হইল এমন এক দর্শন যাহাতে শুধুমাত্র 'বস্তু' সমূহকেই বাস্তব অবস্থা বলিয়া গণ্য করা হয়। এই দর্শন অনুসারে মন বা চেতন হইল শুধুমাত্র বস্তুর অভিব্যক্তি এবং উহাদের ভৌত উপাদানে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। মার্কসীয় ভূগোলের একটি মূল ভিত্তি হইল বস্তুবাদ। ১৯১৭ সালের 'মহান বিপ্লবের' পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে 'মার্কসবাদী' বা 'সমাজবাদী' ভূগোলের সূচনা হয় উহাতে 'দ্বন্দ্বমূলক (Dialectic) এবং ঐতিহাসিক (Historical) বস্তুবাদের নীতি অনুসারে কার্যরত শ্রেণি শক্তিসমূহের নির্ধারণকারী প্রভাবের স্থানানুসারী বিন্যাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) ঃ দ্বন্দ্বমূলক বা dialectic কথাটি গ্রিক ভাষার ' dilego' শব্দ হইতে উদ্ভব হইয়াছে। উহার আক্ষরিক অর্থ হইল 'কথোপকথন' বা 'আলোচনা'। গ্রিক দার্শনিক প্ল্যাটো সর্বপ্রথম 'দ্বন্দ্বমূলক' কথাটি ব্যবহার করেন। যে পদ্ধতিতে আলোচনা যুক্তিতর্ক এবং বাদানুবাদের মাধ্যমে এক সুনির্দিষ্ট উপসংহারে বা প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া যায় উহাকে নির্দেশিত করিবার জন্য তিনি 'দ্বন্দ্বমূলক' কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১৯শ শতাব্দীতে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল সামাজিক পরিবর্তনের যে সূত্র আবিষ্কার করেন উহা 'দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি' (Dialectic Method) নামে জনপ্রিয় হয়। হেগেল-এর মতে বর্তমানে যাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের একটি 'প্রসঙ্গ' (thesis) বলা যায়। এই সকল বিষয়ের অভ্যন্তরে তাহাদের স্ববিরোধিতার উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ওই সকল বিরোধকে এই বিষয়গুলির 'বৈষম্য' (antithesis) বলা যায়। এইরূপ 'প্রসঙ্গ' ও 'বিরোধের' মধ্যে অবসম্ভাবী সংঘাতের ফলে উভয়েই বিনষ্ট হয় এবং পরিশেষে একটি নূতন বিষয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই নূতন বিষয়টিকে 'সমবায়' (synthesis) বলা হয়। এই সমবায় হইল উন্নয়নের একটি উচ্চতর পর্যায়। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে চালনাকারী শক্তি হইল 'ধারণা' 'মন' 'উৎসাহ' অথবা 'অন্তর্নিহিত ঈশ্বর'। সুতরাং হেগেল-এর মতে মূলত ধারণাসমূহই ইতিহাসকে চালনা করে এবং উহারা বাস্তব অবস্থা ও ধারণার মাধ্যমে উদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

হেগেল-এর চিন্তাধারার এক সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা হইল কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁহার মতে বস্তু সমূহ মৌলিক, অবিনশ্বর এবং স্বয়ংচালিত হইবার কারণে উহারাই হইল চালনাকারী শক্তি। মার্কস মূলত হেগেল-এর আদি সূত্রটিকে গ্রহণ করিলেও উহার চালনাকারী শক্তিকে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। মার্কস ওই শক্তিকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঙ্গেলস্ মনে করে যে, দ্বন্দ্ববাদ হইল শুধুমাত্র সেই বিজ্ঞান যাহার সহিত গতির সাধারণ নিয়মাবলী এবং প্রকৃতি মানবসমাজ ও চিন্তাধারার বিবর্তনের সম্পর্ক রহিয়াছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতি সমূহের ভাবার্থগুলি হইল নিম্নরূপ :

(i) বিষয়সমূহ সাধারণভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ উহাদের মধ্যে এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রহিয়াছে।

(ii) বিষয়সমূহকে উহাদের গতিশীলতা, পরিবর্তন এবং উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(iii) পরিবর্তনসমূহ শুধুমাত্র পরিমাণবাচক হয় না, একত্রীকরণের ফলে উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে উহারা গুণবাচক হইয়া থাকে।

(iv) প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সহজাত স্ববিরোধিতা থাকে, কারণ উহাদের সকলেরই অতীত ও ভবিষ্যত রহিয়াছে, এবং কিছু বস্তু বিলুপ্ত এবং অন্য কিছু বস্তু উদ্ভুত হইতেছে। এই দুটি বিপরীত শক্তির সংঘাতের ফলেই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ গঠিত হয়. এবং পরিমাণবাচক পরিবর্তন গুণবাচক পরিবর্তনে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

(v) মানুষ বিবর্তন এবং পরিবর্তনের সূত্রসমূহ আবিষ্কার করিতে সক্ষম। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতি সমূহ হইতে মনে হয় যে, মানুষের চেতনা তাহার অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, মানুষের অস্তিত্বই তাহার চেতনাকে নির্ধারিত করিয়া থাকে। মার্কসীয় দর্শন 'বস্তুবাদী' কারণ দর্শনের মূল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য উহা যে অনুমিত অবস্থা হইতে অগ্রসর হয় উহা হইল—'বস্তু' বা অস্তিত্বই মূখ্য বিষয় এবং 'চেতনা' হইল গৌণ বিষয়। এই দর্শনে পৃথিবীর বাস্তবতা ও ওই বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং পৃথিবীকে উহার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করা হইয়া থাকে। অপরপক্ষে এই দর্শন 'দ্বন্দ্বমূলক' কারণ উহা বাস্তব জগতকে পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষেত্রে তাহার অবিরাম গতি, উন্নতি এবং পুনর্গঠনেকে স্বীকার করিয়া থাকে।

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারণার বিরুধ্বে সমালোচনাগুলি হইল নিম্নরূপ ঃ

(i) মার্কসবাদীগণের মতে, দ্বন্দ্ববাদ হইল এক উচ্চতম মানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। সমাজবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব নহে বহিয়া এক্ষেত্রে পরীক্ষার পরিবর্তে চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু সমালোচকগণ মনে করেন যে, সকল পরিবর্তনই দ্বন্দ্ববাদের নীতি অনুসারী হইলে কোনো আকাঙ্ক্ষিক উদ্দেশ্য পূরণের পরেও পরিবর্তন সমাপ্ত হইতে পারে না।

(ii) আদর্শবাদীরা মনে করেন যে, সকল বিবর্তনের চালনাকারী শক্তি কোনো বস্তু নহে, উহা হইল 'উৎসাহ'। বস্তু হইল একটি প্রাণহীন উপাদান যাহা উৎসাহের মাধ্যমে চালিত না হইলে কোনোরূপ কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) ঃ এই মতবাদে সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতি সমূহ ব্যবহার করা হয়। মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর মনে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহই মানুষের ইতিহাসকে নির্মাণ করে। সামাজিক পরিবর্তনের দুটি মূল উপাদান হইল (i) উৎপাদনের মাধ্যমে (means of production) যেমন—জমি, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি এবং (ii) উৎপাদনের সম্পর্কসমূহ (relations of production) অর্থাৎ সমাজের দুটি শ্রেণি যেমন—যাহারা উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের মাধ্যমে সমূহের মালিক, এবং যাহারা জীবিকা অর্জনের জন্য ওই মালিক শ্রেণির উপর নির্ভরশীল। সামাজিক পরিবর্তনের বস্তুবাদী শক্তির অর্থ হইল 'উৎপাদনের শক্তি সমূহ' (powers of production), যেমন (i) জমি, জলবায়ু মৃত্তিকার উর্বরতা, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ, (ii) অতীতকাল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, এবং (iii) সমকালীন মানুষের মানসিক ও নৈতিক গুণাগুণ। উৎপাদনের এই শক্তিসমূহ হইল ঐতিহাসিক উন্নয়নের নির্ধারক।

মার্কসের মতে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের উন্নতির সহিত বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে সমাজ উন্নতিলাভ করিতে থাকে। নূতন চাহিদার প্রয়োজনে উৎপাদনের মাধ্যমগুলি পরিবর্তিত হয়, এবং উহার প্রভাবে, সমাজেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। সুতরাং মার্কস এবং এঙ্গেলস্ উভয়েই মনে করেন যে, উৎপাদনশীলতার উন্নতি এবং চাহিদা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির

সহিত মানুষের চেতনা উন্নত হইতে থাকে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণ অনুসারে, সকল সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মৌলিক কারণসমূহকে মানুষের মনের অথবা তাহাদের শাশ্বত সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন এবং বিনিময়ের ধরন পরিবর্তনের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সমালোচনা : ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমালোচনায় প্রায়শঃই বলা হয় যে, সামাজিক ইতিহাসের সকল ঘটনাকেই শুধুমাত্র অর্থনীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি অ-অর্থনৈতিক শক্তিকে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনে অর্থনৈতিক অবস্থা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিলেও উহাকে সামাজিক পরিবর্তনের একমা নির্ধারক বলিয়া গণ্য করা যায় না।

মার্কসের দর্শন হইল একটি প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যাহাতে বস্তুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মার্কসীয় ভূগোলে সামাজিক প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং স্থান-ভিত্তিক সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহকে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে।

3.5 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

1) নির্ধারণবাদ ও সম্ভাবনাবাদ-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
2) সবয়ববাদ চিন্তাধারা আলোচনা করুন।
3) বস্তুবাদ চিন্তাধারা বলতে কী বোঝায়?

একক 4 ❒ আঞ্চলিক মতধারা, বাস্তুতন্ত্রের মতধারা ও সম্পদ সম্বন্ধীয় মতধারা

গঠন

4.1 আঞ্চলিক মতধারা

4.1.1 অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ

4.1.2 **Formal Region**-এর সীমাচিহ্নিতকরণ

4.1.3 **Functional Region**-এর সীমাচিহ্নিতকরণ

4.2 বাস্তুতন্ত্রের মতধারা

4.3 সম্পদ সম্বন্ধীয় মতধারা

4.4 প্রশ্নাবলি

4.1 আঞ্চলিক মতধারা (Regional Approach)

অঞ্চলের ধারণার বহুল ব্যবহার ও অপব্যবহার হয়েছে। ফলে অঞ্চলের সংজ্ঞা নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, যা আঞ্চলিক পাঠক একাধিক শাখায় অংশগ্রহণকেই প্রতিফলিত করে। কারও মতে, অঞ্চল একটি বাস্তব একক, যা সদর্থকভাবে (positively) চিহ্নিত করা যায়—যেমন প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অঞ্চল।

সুতরাং অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের বিচার করতে হবে—অঞ্চল একটি স্বাভাবিক ঘটনা (natural phenomenon), না একটি মানসিক চিত্র (mental construction) মাত্র। এ সম্পর্কে দু-ধরনের মত আছে (i) বাস্তুগত (objective) ও (ii) কল্পিত (subjective)।

কল্পিত মত অনুসারে, অঞ্চল হল একটি লক্ষ্যে পৌঁছাবার পদ্ধতি (means to an end), একটি ধারনা মাত্র, একটি আদর্শ (model), যা ভূমণ্ডলকে অধ্যয়নে সাহায্য করে। ইহা হল শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি, স্থান অনুসারে বৈশিষ্ট্যকে পৃথক করার পদ্ধতি, যাতে ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষের আবাসভূমি গণ্য করে একমাত্র প্রাকৃতিক অঞ্চল হিসাবে কল্পনা করা হয়। বস্তুগত মতে, এর ঠিক বিপরীত ধারণা পোষণ করা হয়, অর্থাৎ অঞ্চল নিজেই হল একটি লক্ষ্য, একটি বাস্তব একক, একটি জীব (organism), যা চিহ্নিত করা যায় এবং মানচিত্রে প্রদর্শন করা যায়।

Hartshorne লিখেছিলেন যে, অঞ্চলকে একক স্থূল বস্তু হিসাবে দেখার চেষ্টা ইতিহাসমাত্র। অঞ্চলকে বর্ণনামূলক হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়, একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারে এর সংজ্ঞা নিরূপিত হয়—ফলে যত অঞ্চল বৈশিষ্ট্য তত অঞ্চল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অঞ্চল একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য (function) সমাধান করে, বর্ণনার আত্তিমত্য ছায়াই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অঞ্চলের ধারণা ব্যতিসবাক ব্রিটেনের বর্ণনা এতই সাধারণ হবে যে তার কোন অর্থ হয় না।

অঞ্চলের অস্তিত্ব আছে—এই বস্তুগত মত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেক শিক্ষাবিদ্ দুর্বোধ্য ধারণার অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িত ছিল। অক্সফোর্ড-এর বিন্যাস ভৌগোলিক A. J. Herbertson এক বিশ্লেষণী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং চারটি উপাদান—ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জনসংখ্যা ঘনত্ব, যার মধ্যে জলবায়ুকে প্রধান উপাদান হিসাবে গণ্য করেছিলেন—এর ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠকে প্রাকৃতিক অঞ্চল-এ বিভক্ত করেছিলেন।

স্থানীয় ভিত্তিতে আরও অনেকে তাঁর এই বিশ্লেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন অপরপক্ষে, Unstead সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একটি সংশ্লেষণী (synthetic) পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। প্রাকৃতিক কারণের ভিত্তিতে তিনি ব্রিটেনের একাধিক অঞ্চল গঠন করেছিলেন। Unstead-এর মতে একটি অঞ্চলের সীমানা তার কেন্দ্র থেকে ঠিক কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত যতদূর পর্যন্ত কেন্দ্র বিরাজমান বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। ফ্রান্সে Vidal da la Blacher একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তবে চিহ্নিত করণের জন্য তিনি জনসংখ্যাকে মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও গুরু হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, বস্তুগত মতে যে কোন অঞ্চল space বা স্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কল্পিত মতে ইহা spaceless অর্থাৎ স্থানের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ভৌগোলিক বস্তুগত মতকেই স্বীকার করেন, অপরপক্ষে অর্থনীতিবিদ্‌রা কল্পিত মতকেই অগ্রাধিকার দেন।

4.1.1 অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ (Types of Region)

শ্রেণিবিভাগের পদ্ধতি হিসাবে অঞ্চলের বিকাশ পরিষ্কার দুটো স্তরে ঘটেছে। যাহা সহজ কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক থেকে জটিল শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণ প্রতিফলিত করা। প্রথম স্তরের অঞ্চল হল Formal Region। যা সমধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় স্তরের প্রবেশ হল Functional Region যা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা হয়।

Formal Region-কে একটি ভৌগোলিক ক্ষেত্র বিশেষ যাহা নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সদৃশ অথবা সমধর্মী। Formal Region-এর প্রথম দিকের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল প্রধান প্রাকৃতিক—ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু অথবা স্বাভাবিক উদ্ভিদ যা ভৌগোলিক নির্ধারণতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পরে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়—যেমন শিল্প ও কৃষি। এমন কি সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যও বিবেচিত হয়। প্রাকৃতিক অঞ্চলকে প্রাকৃতিক Formal Region। এই ধরনের অঞ্চলের প্রতি আগ্রহ অংশত এই ধারণা থেকে জন্মেছিল যে, প্রাকৃতিক উপাদান পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক উপাদান অপেক্ষা অনেক বৈশি স্থিতিশীল, ফলে সহজেই অনুধাবন করা যায়, আবার, অংশত Darwin-এর বিবর্তনবাদ থেকেও জন্মেছিল। Darwin-এর Natural Selection ধারণার অনুসরণ করে ভৌগোলিকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে মানুষের অস্তিত্ব তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইহা ভাবা হয়েছিল যে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে পৃথকভাবে অধ্যায়নের মাধ্যমে মানবিক পরিবেশকে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যাবে।

অর্থনৈতিক Formal Region-এর সাধারণ ভিত্তিই হয় কৃষি বা শিল্পের প্রকারভেদ, যদিও এর মধ্যেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখা যায়। অর্থনৈতিক Formal Region-এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল Stamp ও Beaver কৃত ব্রিটেনের ১৯টি কৃষি অঞ্চল, যার ওপর ১৩টি শিল্প-অঞ্চলেও দেখানো হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে, অর্থনৈতিক Formal Region চিহ্নিত কার জন্য মাথা পিছু আয়, বেকারত্বের হার, অর্থনৈতিক বিকাশের হার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

Functional Region হল একটি ভৌগোলিক ক্ষেত্রবিশেষ,. যার মধ্যে ক্রিয়াভিত্তিক সংযুক্তি, বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। কখনও কখনও ইহাতে Nodal অথবা Polarised অঞ্চলও বলা হয় এবং ইহা বিসদৃশ এককের সমন্বয়ে গঠিত যেমন বড় শহর, ছোট শহর, গ্রাম ইত্যাদি, যেগুলো ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য—যেমন চাকুরীস্থলে অথবা ব্যবসাস্থলে যাতায়াতের পৌনপুঃনিকতা ইত্যাদি—ব্যবহার করে ক্রিয়াভিত্তিক সম্পর্ক প্রধানত প্রকারের আহারে প্রকাশ করা হয়।

Ebeneezer Howard, Nodal Region-এর ধারনার অন্যতম আদি প্রবক্তা ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, লন্ডনের ন্যায় বৃহৎ শহরের সমস্যার সমাধান উহার চতুর্দিকে গড়ে ওঠা নতুন শহরগুচ্ছের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শহরের ক্রিয়াভিত্তিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। Patrick Geddes ও তাঁর বিখ্যাত Place work-folk diagram ব্যবহার করে কোন অঞ্চলের উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছিলেন। Geddes ই City region শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, যা Nodal Region এর বহুল ব্যবহৃত রূপ। সম্প্রতি Dickinson, Green ও আরও অনেক Nodal Region এর ওপর গবেষণা করেছেন এবং আরোহ পদ্ধতিতে ঐ ধরনের অঞ্চল সনাক্ত করতে চেষ্ট করেছেন। অপরপক্ষে Christalter এবং Losch আরোহ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে hierarchical সম্পর্কের ওপর জোর দিয়ে এই ধরনের অঞ্চল সনাক্তকরণর চেষ্টা করেছেন।

Formal অথবা Functional উভয়ের সমন্বয় তৃতীয় একপ্রকার অঞ্চলের ভিত্তির জন্ম দেয়, যাকে বলা হয় Planning Region। Planning Region-এর সংজ্ঞা বিভিন্ন। Boudiville-এর মতে, Planning অথবা Programming Region হল এমন একটি অঞ্চল যেখানে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ঐক্য অথবা সংযুক্তি দেখা যায়। Keable এর মতে Planning Region হল এমন একটি অঞ্চল যাহা সীমানার মধ্যে জনসংখ্যার বিন্যাস ও কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট বড়, অথচ পরিকল্পনা সমস্যার সামগ্রিক দৃষ্টিতে খুবই ছোট। Klaassen-এর মতে Planning Region অবশ্যই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত দিতে পারবে, নিজস্ব শিল্পে শ্রমিক যোগান দিতে পারবে, সমধর্মী অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পন্ন হবে, অন্তত একটি Growth Point থাকবে এবং নিজের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকবে।

4.1.2 Formal Region-এর সীমাচিহ্নিতকরণ (Delineation of Regions)

আঞ্চলিকীকরণ (Regionalisation) হল অঞ্চলের সীমাচিহ্নিতকরণ পদ্ধতি। আঞ্চলিকীকরণের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্য এবং রাশিতথ্যের সহজলভ্যতা ইত্যাদির ওপর এই পদ্ধতি নির্ভর করে।

Formal Region-এর সীমাচিহ্নিতকরণ হল সেই সমস্ত স্থানীয় এককে একই শ্রেণিভুক্ত করা, সেগুলো কয়েকটি নির্দিষ্ট উপাদান অনুসারে সদৃশ বা সমধর্মী অথচ ঐ একই উপাদান অনুসারে অঞ্চল বহির্ভূক্ত যে কোন একক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। এইভাবে সৃষ্ট Formal Region কখনই সম্পূর্ণ রূপে সদৃশ বা সহধর্মী হয় না, তবে কিছু নির্দিষ্ট সীমা (limit)-এর মধ্যে সদৃশ হতে বাধ্য। এই ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের সহজ বিচুগত পরীক্ষার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আঞ্চলিকীকরণের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য যদি সহজ ও স্থিতিশীল হয়, তবে সীমাচিহ্নিতকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু উপাদান যদি একাধিক ও বিচিত্র হয়—যেমন বেকারত্বের হার, কর্মী হার, প্রজন্মের প্রবণতা, যাদের অনেকগুলোই পরিবর্তনশীল তবে সীমাচিহ্নিতকরণ বেশ কষ্টকর।)

4.1.3 Functional Region-এর সীমাচিহ্নিতকরণ

Functional Region-এর সীমাচিহ্নিতকরণ বলতে যে সকল স্থানীয় এককের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বর্তমানে তাদের একত্রীকরণকে বোঝায়। ফলে এক্ষেত্রে অঞ্চলের মধ্যে সামগ্রিক সমতা বা সাদৃশ্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় স্থান (Central Point)-এর সঙ্গে প্রবাহের (flow) মাধ্যমে সংযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। Functional Region-এর সীমাচিহ্নিতকরণ-এর যে দুটো পদ্ধতি এবারে আলোচনা করা হচ্ছে, সেগুলো হল —

(i) প্রবাহ বিশ্লেষণ (Flow analysis) যা জনসংগঠন যা করে তার প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং (ii) Gravitational analysis বা জনসাধারণ করতে পারে তার তাত্ত্বিক নিরীক্ষণের ওপর নির্ভরশীল।

(i) **Flow analysis** প্রধান কেন্দ্র ও চতুষ্পার্শ্বস্থ উপকেন্দ্রের মধ্যে প্রবাহের দিক ও তীব্রতার ভিত্তিতে Functional Region গঠন করা হয়। প্রধান কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যতই বাড়ে প্রবাহের তীব্রতা ততই কমে এবং অপর কেন্দ্রের যতই নিকট হয় প্রবাহের তীব্রতা ততই বাড়ে। প্রবাহের তীব্রতা যেখানে সবচেয়ে কম সেখানেই প্রধান কেন্দ্রের প্রভাব-বৃত্ত (Sphere of influence)-এর সীমা চিহ্নিত করা হয়।

প্রবাহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত। ধরণ (type) অনুসারে অর্থনৈতিক প্রবাহ হল—মাল অথবা যাত্রী প্রবাহ, রেল ও সড়ক প্রবাহ এবং উদ্দেশ্য (purpose) অনুসারে অর্থনৈতিক প্রবাহ হল—বিপনন অথবা দৈনন্দিন যাতায়াত প্রবাহ। সামাজিক প্রবাহ যেমন—স্কুল-কলেজ, ছাত্রদের এবং হাসপাতালে রোগীদের প্রবাহ। রাজনৈতিক প্রবাহ—সরকারী খরচ। যোগাযোগ প্রবাহ—টেলিগ্রাম, সংবাদপত্র ও টেলিফোন ইত্যাদি।

(ii) **Gravitational analysis** কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রকৃতি প্রবাহের পরিবর্তে আকর্ষণের তাত্ত্বিক শক্তির ভিত্তিতে Gravitational analysis বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে এই ধরণের বিশ্লেষণকে সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কোন প্রকৃতি প্রবাহই নয়, সম্ভাব্য প্রবাহগুলো সম্পর্কেও ভাল ধারণা পাওয়া যেতে পারে। Social physics-এ এই ক্রমবিকাশশীল কেন্দ্রটি Zipf, Reilly, Stewart, Stouffer এবং আরো অনেকের সম্মিলিত গবেষণার ফল। এর ভিত্তি হলো মানুষের মধ্যে মিথক্রিয়ার সম্ভাবনা, Newton এর পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যুক্তির ভিত্তিতেই এর সৃষ্টি।

Gravity model-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— যে কোন দুটো কেন্দ্রের মধ্যে মিথক্রিয়া ঐ দুটো কেন্দ্রের Mass (জনসংখ্যা)-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল (Directly proportional) বা সমানুপাতিক এবং ঐ দুই কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী দূরত্বের সঙ্গে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল অর্থাৎ ব্যস্তানুপাতিক হারে হ্রাস পায়। Mass ও Distance পরিমাপের জন্য কি ধরনের চল (variable) ব্যবহার করা হবে তা সমস্যার ধরণ ও রাশিতথ্যের সহজলভ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই Model-এ জনসংখ্যা, কর্মে নিযুক্তি, আয়, ব্যয় এবং খুচরো ব্যবসার পরিমাণ ইত্যাদির দ্বারা Mass এবং রৈখিক মাপ (মাইল, কিলোমিটার) সময়, মূল্য এবং অন্তবর্তী সুযোগ সুবিধার সাহায্যে distance পরিকল্পনা করা হয়েছে।

4.2 বাস্তুতন্ত্রীয় মতধারা (Ecological Apporoach)

ভূগোল সর্বপ্রথম বাস্তু সংস্থানের নীতি ও পদ্ধতিগুলি জীবভূগোল গ্রহণ করে। ক্রমশঃ ভৌগোলিকেরা মানুষের কাজকর্মকেও জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ও ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। ১৯১০ সাল থেকে মানুষ ও পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোঝানোর জন্য মাননীয় বাস্তুসংস্থান (Human Ecology) শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত হয়। প্রকৃতির অন্তর্গত জীবসমূহের মধ্যে মানুষের স্থান ঠিক কোথায় এবং অন্যান্য জীব সমূহের মতই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ কিভাবে গড়ে উঠেছে—এই সকল বিষয় নিয়ে সমীক্ষা করে মাননীয় বাস্তুসংস্থান। আমেরিকান ভৌগোলিকদের সভাপতি এইচ. এইচ. ব্যারোস তাঁর এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে ভূগোলে নিজস্ব একটি নিয়োগ ক্ষেত্র এবং নিয়ন্ত্রক দৃষ্টি বিন্দু থাকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তা একমাত্র সম্ভব যদি ভূগোলকে মানবীয় বাস্তুসংস্থান হিসেবে দেখা যায়। ব্যারোসের মতে ''ভূগোল হল মানবীয় বাস্তুসংস্থানের বিজ্ঞান'।

পরিবেশ যে মানুষের কার্যাবলীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, এই তত্ত্ব ডারউইনের জীববিবর্তন ধারণা থেকে গড়ে ওঠে। ডারউইন জোরের সঙ্গে বলেন যে, প্রকৃতির নিয়ম অন্য সকল বিক্রয়ের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশীল। ফ্রেডারিক র‍্যাটভেলে, ই. সি. কোম্পল (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), ই. হান্টিংটন (গ্রেট ব্রিটেন) ডি. প্লে (পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া) প্রভৃতি সুপরিচিত প্রবক্তা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনসুরণ করেন।

বাস্তুসংস্থান দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝতে হলে বাস্তু সংস্থান, মানবীয় বাস্তুসংস্থান এবং বাস্তুতন্ত্র পদগুলির মৌলিক ধারণাগুলি জানা প্রয়োজন। বাস্তুসংস্থান হল জীবের ব্যঙ্গ বা বসবাসের বিজ্ঞান। এটা হলো এমন এক বিজ্ঞান যা জীবের বেঁচে অবস্থা এবং বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন জীব ও পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে।

মাননীয় বাস্তুতন্ত্র বলতে বোঝায় প্রকৃতিতে মানুষের স্থান। এটা ঠিক প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণবাদও নয় বা যুক্তিনিষ্ঠ পরিবেশ ব্যবহারও নয়। এটাকে সফলোচিত মানবীয় ভূগোলের পরিবর্তে ব্যবহার করা হতে থাকে। মাননীয় বাস্তুসংস্থানের জীবনের জটিল প্রকৃতির ভারসাম্য প্রতিযোগিতা প্রাধান্য অর্জন এবং পরম্পরা (Succession) প্রভৃতি ধারণাগুলি অনুধাবন করা হয়। ১৯২৩ সালে অ্যাসোসিয়েশন অফ্ অ্যামরিকান জিওগ্রাফারস্-এর সভাপতি বক্তৃতায় বলেন যে, পরিবেশের সঙ্গে মানুষ কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে তা মানুষ প্রকৃতির সম্পর্কে বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির হওয়া উচিত এবং আঞ্চলিক ভূগোল হল প্রকৃতপক্ষে এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানবীয় বাস্তুসংস্থানের সমীক্ষা।

বর্তমান শতাব্দীর ৬০-এর দশকে মানবীয় বাস্তুসংস্থান দৃষ্টিভঙ্গী ভূগোলে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বৃহত্তর। বাস্তুতন্ত্রের মানুষের স্থান নির্ণয়ের উপর মনোনিবেশ করা হয়।

১৯৩৫ সালে এ. জি. ট্রান্সলে তাঁর পুস্তক Ecology তে এবং ১৯৪৬ সালে তাঁর আর এক পুস্তক ‘ Plant Ecology’ বাস্তুতন্ত্রে (Ecosystem) পদটি ব্যবহার করেন, বাস্তুতন্ত্র ধারণায় চারটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান—

১) এটা অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ সমস্ত জীবজগত সম্মিলিত ভাবে একটি এককের সৃষ্টি করে।

২) এটার একটা কাঠামো রয়েছে।

৩) এর এক কার্যপ্রণালী রয়েছে।

৪) সাধারণ প্রণালীর গুণাগুণ বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে।

বাস্তুসংস্থান দৃষ্টিভঙ্গি বনাম নব নিয়ন্ত্রণ বাদ ঃ—

বাস্তুসংস্থানগত নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তু সংস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তুসংস্থান দৃষ্টিভঙ্গীকে নব্য নিয়ন্ত্রণবাদ ও কোন এক এলাকার মানুষ ও পরিবেশের নিছক বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ যা চিরাচরিত আঞ্চলিক ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গী কোনটি কেউ স্বতন্ত্রভাবে সমর্থন করে না। প্রচলিত আঞ্চলিক ভূগোলের বর্ণনায় বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক ভাবে সাজানো রয়ে থাকে। মানবীয় বাস্তুসংস্থানের কঠোর নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় না। আঞ্চলিক ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণার অঞ্চল সনাক্তকরণে কার্য ছিল এবং ভূগোল এতে লাভবান হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতেই অঞ্চল সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। এর কক্ষক্ষেত্রে জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব তেমনভাবে গণ্য করা হয় নি। কিন্তু প্রণালীবাদ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমীক্ষা উপরোক্ত দুই পদ্ধতির দুটিকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

বিশ্বমতামত ও কার্যপরিচালনা : বাস্তুসংস্থান দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে প্রকৃতির এক অংশ বলে দেখা হয়। এক অংশ যার মধ্যে চিন্তাশক্তি, শ্রম এবং প্রকৃতির প্রত্যেক সুযোগকে প্রকৃতির প্রত্যেক উপাদান থেকে নিজের কল্যাণের জন্য সবরকম সুযোগ সুবিধা গ্রহণের সক্ষমতা রয়েছে। মানুষ প্রকৃতির শিকারী বা ছিনতাইকারী হিসেবে আচরণ করতে পারে। আবার এমন ক্ষমতাই রয়েছে যে সে যে প্রকৃতিতে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাকে নিরাময় করা এবং উচ্চতলের প্রকৃতিকে ভারসাম্য আনয়নে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে এই সামর্থ্যের যেন সীমা নেই। মানুষের ক্ষমতা যেমন বেড়েছে সভ্যতা তত এগিয়েছে। যখন মানুষের সংখ্যা কম ছিল তখন মানুষ ও প্রকৃতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ও নিম্ন স্তরে বর্তমান ছিল। একটি বন্ধ বর্তনীতলে (close plane) এই সামঞ্জস্য সম্ভব। এই সম্যসার যথার্থ অনুধাবন বাস্তুসংস্থানিক পুনসামঞ্জস্য বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯৯২ সালের জুন মাসের রায়ো ডিজেপেরোতে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে যে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও এরকম বাস্তুসংস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। এই বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের তিনটি শ্লোগান এর উদ্ভব হয়। যথা— (i) দারিদ্র্য হলো সববৃহৎ দূষণ এবং দারিদ্র দূরীকরণে সর্বোত্তম ব্যবস্থান গ্রহণ প্রয়োজন। (ii) বিশ্ব উষ্ণীভবনের (Global Warming) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, (iii) ধ্বংসোন্মুখ প্রাণী ও প্রজাতি সংরক্ষণ।

পোষণমূলক মানব সভ্যতার বিকাশের প্রশ্ন :—

পোষণমূলক বিকাশের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্প্রতি বজায় রেখে স্বাস্থ্যপ্রদ এবং উৎপাদনশীল জীবন যাপনের অধিকার মানুষের আছে। এরকম পোষণমূলক বিকাশের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বর্তমানে বিকাশকে পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ হীন করে কেবলমাত্র সমসাময়িক পরিবেশ পরিচালনা পরিবেশ অবক্ষয় রোধে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক নব্য নিয়ন্ত্রণ। ধারণার অনুরূপ, রায়োডিজেনিরো বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল করে বহুসংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গীর গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সেই হিসেবেও ভূগোল সমীক্ষাতেও বাস্তু সংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের উপযোগিতা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

4.3 সম্পদ সম্বন্ধীয় মতধারা (Resource Approach)

কোন বস্তু বা পদার্থ যে কাজ সম্পন্ন করে বা কোন বস্তু বা পদার্থের মধ্যে যে কার্যকরী শক্তি নিহিত রয়েছে তাকে সম্পদ বলে। অর্থাৎ সম্পদ হল পদার্থের সেই কাম্য শক্তি বা মানুষের অভাব মোচন করে—চাহিদা পূরণ করে। সম্পদ হল মানুষের পার্থিব ও আর্থ সামাজিক পরিবেশের উপাদান। সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি। কিন্তু সম্পদ সম্বন্ধে মানুষের যে উপলব্ধি তা আপেক্ষিক। এ সম্বন্ধে পরিমণ্ডলের মধ্যে কোন পদার্থ সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে এ জাতীয় কোন স্থির সিদ্ধান্ত থাকা সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞানই সকল সমবাদের সৃষ্টিকর্তা। যেমন প্রাথমিক অবস্থায় সম্পদের পূর্ণ প্রকৃতি যখন অধরা ছিল, সম্পদের বৈশিষ্ট্য সম্পদে মানুষের পূর্ণ ধারণা ছিল না, ছিল কিন্তু ভ্রান্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার নিরন্তর ফসল হল সম্পদের গতিশীল চরিত্রের আবিষ্কার এবং মানুষের এই জ্ঞান এবং প্রয়োগকৌশলই বস্তুকে সম্পদে পরিণত করে। বর্তমানে সম্পদ সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা থেকে বলা যায় যে কেবলমাত্র বস্তু বা স্পর্শযোগ্য যেমন খনিজ পদার্থ, জল, বাতাস ইত্যাদিই নয় অবস্তু যা মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভুত যেমন নৈপুণ্য, দক্ষতা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, ইত্যাদিও সম্পদ। সুতরাং সম্পদ হল সেই সমস্ত উপকরণ যা মানুষের আকাঙ্ক্ষাপূরণে সক্ষম, সামাজিক লক্ষ্য পূর্তির অনুকূল তাই সম্পদ।

4.3.1 সম্পদের সংজ্ঞা :—

সম্পদ কোন বস্তু বা পদার্থ নয়। এটি হল প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিরন্তর আন্তঃক্রিয়ার ফল। সম্পদ হল পদার্থের সেই কাম্য শক্তি যা মানুষের অভাব মোচন করে—চাহিদা পূরণ করে। সম্পদ নিজে কোন দৃশ্যক স্পর্শযোগ্য বস্তু নয়, কিন্তু এর উপাদানগুলিকে একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে সেই পরিবেশের উপকরণগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম ও সামাজিক লক্ষ্য পূর্তির অনুকূল। এই সম্পর্কে Prof. E. W. Zommermann-এর দেওয়া বিখ্যাত সংজ্ঞাটি হল— " Resource does not refer to a thing or a substance but to a function which a thing or substance may perform or to an operation in which it may take part, namely the function or operation of attaining a given end such as satisfying a want.' ' অর্থাৎ কোন বস্তু বা পদার্থ যে কাজ সম্পন্ন করে বা কোন বস্তু বা পদার্থের মধ্যে যে কার্যকরী শক্তি নিহিত রয়েছে তাকে সম্পদ বলে।

একটি বস্তু বা পদার্থ সম্পদে পরিণত হয় তার কার্যকারীতার দ্বারা যা মানুষের সঠিকভাবে চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। যেমন একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার হল সম্পদ আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু কোন প্যালিওনিহিক মানব বা প্রান্তীয় দৃষ্টি অরণ্যের কোন পিরামির কাছে এটি সম্পদ নয়। যেহেতু এটি তাদের চাহিদা পূরণ বা সজ্জা মোচনের কোন কাজে লাগে না। সুতরাং যা মানুষের ব্যক্তিগত অভাব বা সামাজিক চাহিদা মোটানোর উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থান বা কালের গন্ডির মধ্যে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে তাই সম্পদ)।

4.3.2 সম্পদের শ্রেণিবিভাগ :—

সম্পদের অন্তর্নিহিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপলব্ধি করা এবং সম্পদের কার্যকরী শক্তিকে সুষমভাবে ব্যবহার করার জন্য যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দরকার হয় সেই লক্ষ্য সম্পদের শ্রেণিবিভাগ এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বিভিন্নভাবে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমনঃ—

১) সম্পদের সৃষ্টির উপাদানের ভিত্তিতে সম্পদ তিন প্রকার যথাঃ—

ক) প্রকৃতির সম্পদ যা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উপলব্ধ যেমন সূর্য্যকিরণ, খনিজ ইত্যাদি।

খ) মানবিক সম্পদ অর্থাৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যেখানে সম্পদ বা সৃষ্টির সহায়ক উপাদান যেমন কৃষি শ্রমিক, খনি শ্রমিক ইত্যাদি।

গ) সাংস্কৃতিক সম্পদ অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভুত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেমন শিক্ষা, শিল্প, প্রযুক্তি ইত্যাদি।

২) সম্পদের স্থায়ীত্বের ভিত্তিতে সম্পদ দু প্রকার যথা ঃ—

ক) গচ্ছিত-ক্ষয়িষ্ণু-অবুনার্ভব সম্পদ অর্থাৎ যার পরিমাণ সীমিত, যা ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে নিষ্কাষিত হয় এবং যা পুনরায় সমপরিমাণ সৃষ্টি করে পার্থিব পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন— খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি।

খ) প্রবহমান-অফুরন্ত-পুনর্ভাব সম্পদ অর্থাৎ যার ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পরিমাণগত কোন তারতম্য ঘটে না, যা নিরন্তর ব্যবহারের দরুণ নিঃশেষিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। যেমন সূর্য্যকিরণ, বাতাস ইত্যাদি।

৩) সম্পদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দু'ধরনের যথাঃ—

ক) জৈব সম্পদ যা মানুষের কাজের উপযোগী এবং জীবজগৎ থেকে আহরণ করা হয় যেমন— কাঠ, মাছ, দুধ ইত্যাদি।

খ) অজৈব সম্পদ অর্থাৎ যা জীবজ উৎস থেকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ যা জড় চরিত্রের কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত। যেমন—আকরিক লোহা, জল, অক্সিজেন ইত্যাদি।

৪) অবস্থান অনুসারে ইহা দু প্রকারের ঃ—

ক) আঞ্চলিক সম্পদ অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ বা প্রাকৃতিক পরিবেশে সর্বত্র যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন— সোনা, লোহা, তামা ইত্যাদি।

খ) সর্বব্যাপ্ত অর্থাৎ যা কোন আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। যেমন—বাতাস, জন্তু, সূর্য্যকিরণ।

৫) সম্পদের প্রাপ্তি অনুসারে ইহা দু'ধরনের যথা ঃ—

ক) প্রকৃত বা সমৃদ্ধ সম্পদ অর্থাৎ যা ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে চলেছে যা সঞ্চিত অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে নেই। যেমন— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদির জলবিদ্যুৎ সম্পদ।

খ) সম্ভাব্য সম্পদ অর্থাৎ যার ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে এবং ব্যবহারযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঐ সম্পদের পুর্নব্যবহার সম্ভব হয়নি। যেমন— আফ্রিকার জলবিদ্যুৎ সম্পদ।

৬) মালিকানার ভিত্তিতে ইহা চার প্রকার। যথা ঃ—

ক) ব্যক্তিগত অর্থাৎ যা ব্যক্তি মালিকানাধীন যেমন— কৃষকের জমি, সংযোজকের শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

খ) সামাজিক অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলের জন্য সমাজের অধীন সম্পদ যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি।

গ) জাতীয় অর্থাৎ যা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন যেমন— স্বর্ণখনি, তৈলক্ষেত্র, রেলপথ, বন্দর, বাঁধ ইত্যাদি।

ঘ) আন্তর্জাতিক অর্থাৎ যা সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণে নিয়োজিত যেমন— কুমেরু মহাদেশীয় অঞ্চল, বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তর ইত্যাদি।

৭) উপলব্ধি অনুসারে সম্পদ দু প্রকার। যথা—

ক) বস্তুগত অর্থাৎ যা স্পর্শযোগ্য এবং পদার্থের যে কোন একটি অবস্থার (কঠিন, স্থল, গ্যাসীয়) অধীন। যেমন—খনিজ, জল, বাতাস ইত্যাদি।

খ) অবস্থাগত অর্থাৎ বস্তুগত বিপরীতধর্মী উপযোগী উপাদান যা স্পর্শযোগ্য নয় এবং প্রধানত মানুষের সংস্কৃতির পরিবেশ থেকে উদ্ভুত যেমন— নৈপুণ্য, দক্ষতা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ইত্যাদি।

4.3.3 পূর্ণভব ও অপূর্ণভব সম্পদের পার্থক্য :

যে সব সম্পদ একেবারে নিঃশেষিত না হয়ে ব্যবহারের ফলে কমে গিয়েও পরে তা পূরণ হয়ে যায় তাদের পূর্ণভব বা পূরণশীল সম্পদ বলে। আর যে সব বস্তু বা দ্রব্য একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষিত হয় এবং যাদের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা থাকে না তাদের অপূর্ণভব বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলে।

অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণভব সম্পদের যোগান সীমিত হলেও এরা একেবারে নিঃশেষিত হয় না। ব্যবহারের ফলে হ্রাস পেলেও পুনরায় তারা বৃদ্ধি পেয়ে পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু অপূর্ণভব সম্পদ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ীভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে একদিন বিলুপ্ত হয়। পূর্ণভব সম্পদের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে কৃষিজ ফসল ব্যবহারের ফলে ক্ষয়

পেলেও তা বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিজ ফসল বারবার উৎপন্ন করা যায়। কৃষিজ সম্পদ ছাড়াও মৎস্যক্ষেত্রে, বনভূমি, পশুচারণক্ষেত্র ইত্যাদি। আর অপূর্ণভব সম্পদের উদাহরণ হল খনিজ সম্পদ, যেমন— লোহা, কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি।

4.3.4 গচ্ছিত ও প্রবহমান সম্পদের মধ্যে পার্থক্য :—

গচ্ছিত সম্পদ বলতে বোঝায় যে সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট (Limited) তাকে। এর অন্য নাম সঞ্চিত সম্পদ। আর প্রবহমান সম্পদ বলতে বোঝায় সেই সম্পদকে যা অসীম এবং যার কোন শেষ নেই। এই জাতীয় সম্পদের পরিমাণ অনির্দিষ্ট।

গচ্ছিত সম্পদ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে বিলুপ্ত বা শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ এই ক্রমহ্রাসমান। সেজন্য একে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদও বলে। কিন্তু প্রবহমান সম্পদ বিলুপ্ত হয় না। এজন্য একে পূরণশীল সম্পদও বলা হয়।

গচ্ছিত সম্পদকে পুনরায় সৃষ্টি করে পার্থিব পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ খনিজ তেলের ভাণ্ডার অটুট রাখার জন্য গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তেল তৈরি করে খনির মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন উপায় নেই। কিন্তু প্রবহমান সম্পদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পার্থিব শক্তি প্রবহমান সম্পদের ভাণ্ডারকে অটুট রাখে। মানুষ তার কাজের জন্য এই সম্পদের যতটুকু আহরণ করে প্রাকৃতিক শক্তি ততটুকু ফিরিয়ে দেয়। ফলে জমা খরচের হিসাবে ভারসাম্যতা নষ্ট হয় না। কিন্তু গচ্ছিত সম্পদের নবীকরণ সম্ভব নয় বলে একে অপূর্ণভব সম্পদও বলা হয়।

গচ্ছিত সম্পদের অবস্থান নির্দিষ্ট অর্থাৎ এই ধরণের সম্পদ প্রকৃতির নির্দেশে নির্ধারিত ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এজন্য একে আঞ্চলিক সম্পদ বলে। কিন্তু প্রবহমান সম্পদগুলি সাধারণতঃ পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। কোন ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা থাকে না বলে এদের সর্ব্বব্যাপ্ত সম্পদও বলা হয়।

গচ্ছিত সম্পদের উদাহরণ হল বিভিন্ন খনিজ সম্পদ যেমন কয়লা, তামা, খনিজ তেল ইত্যাদি। আর প্রবহমান সম্পদের উদাহরণ হল সূর্য্যকিরণ, বাতাস, উত্তাপ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

সর্ব্বব্যাপ্ত ও আঞ্চলিক সম্পদ (Ubiquitous or non Ubiquitous resource) :—

সম্পদের বণ্টন অনুসারে সম্পদকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সর্ব্বব্যাপ্ত সম্পদ ও আঞ্চলিক সম্পদ।

আঞ্চলিক সম্পদ (Localised or Non-Ubiquitous) :—

যে সমস্ত সম্পদ আঞ্চলিক পরিসীমা বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের সর্বত্র যে সম্পদগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে আঞ্চলিক সম্পদ বলে। আঞ্চলিক সম্পদ মানব জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। আঞ্চলিক সম্পর্দের উদাহরণ হল খনিজ তেল, কয়লা, বক্সাইট, সোনা লোহা ইত্যাদি।

সর্ব্বব্যাপ্ত সম্পদ (Ubiquitous Resource) :—

যে সমস্ত সম্পদ নির্দিষ্ট কোন আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেই সম্পদগুলিকে সর্ব্বব্যাপ্ত সম্পদ বলে। যেমন বাতাস, জল, সূর্য্যকিরণ ইত্যাদি।

4.3.5 দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক জমি (Two dimentional or three dimentional land) :—

দ্বিমাত্রিক জমি—দ্বিমাত্রিক জমি হল ভূ-পৃষ্ঠের উপর যে কোন স্থানে অবস্থিত কোন ভূখণ্ড, যা চাষ আবাদ, পশুপালন, মাছ ধরা, বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা ইত্যাদি মানুষের বিভিন্ন প্রাথমিক কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিমাত্রিক জমির বহিরাবরণটিকেই মাত্র সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ভূমির উপরের আবহমণ্ডল বা নীচে শিল্পমণ্ডলের অন্তর্গত বিশাল ক্ষেত্র দুটির কোন অংশকেই জমির দ্বিমাত্রিক আয়তনের মধ্যে কার্য্যকর ভাবে ব্যবহার করা যায় না, দ্বিমাত্রিক জমি অনগ্রসর জৈবশক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতীক। কারণ জমির নিজস্ব উর্বরতা শক্তির ব্যবহার ছাড়া জমিকে অন্য কোনভাবে কার্যকর করার প্রযুক্তিগত সামর্থ্য অনগ্রসর অর্থনীতিতে, শিক্ষা দীক্ষা, দক্ষতা, মূলধন ও বিনিয়োগের দীনতার জন্য সম্ভবপর হয় না। যেমন ছিল সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থায় ও বর্তমানে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলিতে যেমন—আফ্রিকার বুসুণ্ডি, মালি, সোমালিয়া, টোগো ইত্যাদি রাষ্ট্রে। অর্থাৎ জমির দ্বিমাত্রিকতা এবং পশ্চাদপদ অর্থনীতির অন্যতম সূচক হল উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জৈবশক্তির ব্যাপক ব্যবহার।

অবশ্য জমির দ্বিমাত্রিকতা কালের বা সময়ের নিরিখে গতিহীন নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবহনের মাধ্যমে ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা কমে জনপদ ছড়িয়ে পড়লে জমির আয়তনগত ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেলেও জমির দ্বিমাত্রিক চরিত্র বজায় থাকবে।

ত্রিমাত্রিক জমি— জমির ত্রিমাত্রিক রূপকল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বস্তুতঃ সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি। জমির ত্রিমাত্রিক ধারণা উৎস। ভূমি যেখানে শুধু ক্ষেত্রফল নির্ভর ভৌগোলিক আয়তন নয়, যেখানে ভূমিভাগের উপরে বায়ুমণ্ডল ও নিচের শিল্পমণ্ডলের বিস্তৃত ক্ষেত্র, সম্পদ আহরণের প্রেক্ষিত সদাকর্মময়, সেই ঘন আয়তন বিশিষ্ট জমি ত্রিমাত্রিক চরিত্রের। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক জমি শুধুমাত্র কৃষিকর্মের উপযোগী ভূখণ্ড নয়, এই বর্ধিত কার্যকারীতা সম্পন্ন ভূমিভাগ খনিজ পদার্থ আহরণের উপযুক্ত, সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশ হতে সম্পদ সংগ্রহে সক্ষম, আবহমণ্ডল থেকে শক্তি উৎপাদনে নিপুণ। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক জমি মানুষের সমুদয় অর্থনৈতিক কাজের ধারক, বাহক ও অনুঘটক।

ত্রিমাত্রিক জমি উন্নত জড়শক্তি নির্ভর, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতীক। কারণ জমিকে কৃষিকর্মে ব্যাপৃত রাখা ছাড়াও শ্রমশিলতা ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধারার উপযোগী করে জমিক প্রস্তুত করার জ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের আয়ত্তাধীন, শিক্ষার প্রসার, গবেষণায় সাফল্য, মূলধনের প্রাচুর্য্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলির ক্রমবিকাশ জমিকে ক্রমশ দ্বিমাত্রিক করে তোলে। যেমন বলা যায় বর্তমানের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে উপযুক্ত আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর অনুকূল্যে জমি ত্রিমাত্রিক রূপ ধারণ করেছে।

জমির ত্রিমাত্রিকতা, কাল বা সময়ের নিরিখে গতিশীল এবং ক্রমবিকশিত ধারণা, কার্য্যত ত্রিমাত্রিক জমি সীমাহীন। কারণ দ্বিমাত্রিক জমির ক্ষেত্রফল, কখনই পৃথিবীর আপন আয়তনের থেকে বড় হতে পারে না। কিন্তু ত্রিমাত্রিক জমির যে লম্বমান আজ মহাশূন্যে অনন্তের দিক নির্দেশ করে ($y \rightarrow o$) সেই অন্তরীক্ষে মানুষের ক্রমবর্ধমান সাফল্য, জমির উৎসসীমাকে সৌরজগতের উপান্তে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

4.4 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

1) আঞ্চলিক মতধারা ও সম্পদ সম্বন্ধীয় মতধারার মধ্যে পার্থক্য কী?
2) অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ করুন।
3) Formal Region এবং Functional Region -এর সীমাচিহ্নিতকরণ করুন।
4) বাস্তুতন্ত্রীয় মতধারা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পর্যায় : EGR - 11 : 02

একক 1 ❐ সংস্কৃতির উৎস, বিকাশ এবং তার বিকেন্দ্রীকরণ (Origin, Growth and Divergence of Cultural Systems)

গঠন

1.1 সংস্কৃতির ধারণা (Concept of Culture)

1.2 সংস্কৃতির উৎস (Origin of Culture)

1.3 সংস্কৃতির বিকাশ (Growth of Culture)

1.4 সাংস্কৃতিক বিকেন্দ্রীকরণ (Divergence of Culture)

1.5 প্রযুক্তির উন্নতি ও বিস্তার (Development and Spread of Technology)

1.6 সাংস্কৃতিক প্রণালীর সমকেন্দ্রিকতা ও ব্যাপন (Convergence and Diffusion of Culture)

1.7 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

1.1 সংস্কৃতির ধারণা (Concept of Culture)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মনুষ্যগোষ্ঠী বা সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব রয়েছে। সংস্কৃতি মানবগোষ্ঠীর স্বকীয়তার পরিচায়ক এবং মানবসমাজকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার মানদণ্ড স্বরূপ। প্রকৃত মানুষের যাবতীয় অনুপম বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় তার সাংস্কৃতির মাধ্যমেই।

অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে তা সবই সম্ভব হয় তার সংস্কৃতির মাধ্যমে। মানুষের তৈরি সকল দ্রব্য, সমস্ত দক্ষতা এবং তার উজাড় করা জ্ঞানের ভাণ্ডারকে একত্রে 'সংস্কৃতি' বলা হয়। মানুষ এবং প্রকৃতি—এই দু'য়ের মিলিত প্রচেষ্টা এবং প্রয়াসের মিলিত উৎপাদন হ'ল সংস্কৃতি। ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি বলতে তাদের ধারণা, বিশ্বাস, আদর্শ, আইনকানুন, ভাষা, বিদ্যাবুদ্ধি, নৈপুণ্য, কারিগরি দক্ষতা, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়—যা পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত হয়েছে—তার সমষ্টিকেই বোঝায়। প্রকৃতিকে মানুষ তার কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ (resource) বা উপকরণ তৈরি করে তার অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সংস্কৃতি। আবার সংস্কৃতির অনেক বিষয় নিজেই সম্পদে পরিণত হয়।

বিভিন্ন দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত নৃ-বিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নানাদিকে তাঁদের পরিব্যাপ্ত ধারণাকে উপস্থাপিত করেছেন। অধ্যাপক ম্যালিনস্কিরর মতে, 'সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু'। ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বাট স্পেনসার সংস্কৃতিকে মানুষের জৈবিক গঠনে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে যে সব দান গ্রহণ করে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাকে আরো কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশল অবলম্বনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সংস্কৃতি। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির মতে, ব্যাপক অর্থেই শিক্ষা, সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয় বহন করে থাকে। শুধুমাত্র সমাজজীবনের প্রস্তুতি নয়।' ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল মানব জীবনের চরম লক্ষ্য, মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশ। নৃতত্ত্ববিদ্ E. B. Taylor (১৮৯১) বলেন,

'সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ যে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পনৈপুণ্য, নৈতিকতা, নিয়ম, রীতি এবং অন্যান্য সক্ষমতা ও অভ্যাস অর্জন করে সেগুলির সামগ্রিক জটিল অবস্থাকেই সংস্কৃতি বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূগোলবিদ্ H. J. De Blig (১৯৭১) বলেন, 'সংস্কৃতি' শব্দটি মানব জগতের বিরাট অংশে ব্যবহার করা যায় এবং এটি আপেক্ষিকভাবে ছোট এককগুলির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। Haebel-এর মতে, 'সংস্কৃতি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যবহার পদ্ধতির সামগ্রিক অবস্থা, এগুলি কোন সমাজের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য'। সুতরাং এগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জৈবিক ফল নয়।' এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ Dan'd L. Linton, বলেন, 'সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক ঐতিহ্য।'

পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ গুণীজনদের 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ পাবার পর এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সহজ ধারণা করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বর্ণনা করলে 'সংস্কৃতির' যে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তা হ'ল ঃ-

(১) সংস্কৃতির শিক্ষা নিতে হয়।

(২) সংস্কৃতি ধারণালব্ধ জিনিস।

(৩) সংস্কৃতি সামাজিক বিষয়বস্তু।

(৪) সংস্কৃতি বাসনা চরিতার্থকারক।

(৫) সংস্কৃতি অখণ্ড, এবং

(৬) উপযুক্ত সংস্কৃতি অনুকরণযোগ্য।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বলা যায় যে বর্তমান প্রজন্ম তার সংস্কৃতির সন্ধান করতে পারে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষজনের কাছ থেকে। নবজাতকের কোন সংস্কৃতি থাকে না। সুতরাং সংস্কৃতির ধারণা জন্মসূত্রে লাভ করবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুযুক্তি, সুপরামর্শ, সুচিন্তা পদ্ধতি এবং সুশিক্ষা—মূলতঃ এই বিষয়গুলি নিয়েই চর্চা বা জ্ঞানলাভ করলে সুস্থ সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটতে পারে। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং উৎকর্ষ সংস্কৃতি বিকাশের এক অন্যতম মাধ্যমও বটে। পাশাপাশি একথাও স্বীকার করতে হয় যে, সুস্থ সমাজ ছাড়া কোন সংস্কৃতি স্থায়ী হতে পারে না। সমাজ সব সময়েই তার সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং আপাত পরিতৃপ্ত সমাজে একটি আদর্শ সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারা যায়। এছাড়া সংস্কৃতিকে অবশ্যই সমাজের পরিবেশের সাথে উপোযোগী হতে হবে। পরিবেশের সাথে উপযোগী না হলে অন্য কোন সংস্কৃতি অপর একটি সমাজের সংস্কৃতিকে প্রবেশ করতে পারে না।

সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, বিশুদ্ধ এবং অখণ্ড। কোন দেশ বা অঞ্চলের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা বা অংশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার বহু নজির আমরা পেয়ে থাকি।

1.2 সংস্কৃতির উৎস (Origin of Culture)

কবে, কোথায়, কিভাবে মানুষের জন্ম হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও একথা সত্যি যে সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবার, তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবার এবং প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার কৌশল আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে। সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হলেও, মানুষ তার ধীশক্তি, মননশক্তি, বুদ্ধিমত্তার প্রখরতার সাহচর্যে শেষ পর্যন্ত জৈব পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার এবং কর্তৃত্ব স্থাপনের উপযুক্ত প্রাযুক্তিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। সাংস্কৃতিক ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রে 'সভ্যতা' ও সংস্কৃতি' দুটি শব্দের সম্পর্কে খুবই নিবিড় এবং ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীর সভ্যতা বিকাশের স্থানগুলি, যেগুলি 'সাংস্কৃতিক সুতিকাগার (Cultural

hearth) হিসাবে বিবেচিত (যথা নীলনদের সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, হোয়াংহো বা চৈনিক সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ইত্যাদি) সেগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে এক একটি সংস্কৃতির উৎসস্থল হিসাবে চিহ্নিত— এ কথা আমরা বলতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূগোলবিদ্ Carl. O. Saugn-এর মতামত নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে—

(১) পাহাড় ও উপত্যকাবিশিষ্ট ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন;

(২) মোটামুটি সহনশীল জলবায়ু;

(৩) জীবনধারণের উপযুক্ত একটি সীমাবদ্ধ স্থান;

(৪) ঋতু-বৈচিত্র্যের উপস্থিতি— যা উদ্ভিদের বিকাশে ও বিশ্রামের সহায়ক;

(৫) নূন্যতম কাঁচামালের বৈচিত্র্য এবং

(৬) সহজে পরিবর্তনশীল স্থানীয় স্বাভাবিক উদ্ভিদ—এই কয়েকটি প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ যদি বর্তমান থাকে, তাহলে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন ভূখণ্ড তার স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজের কাছে উপস্থিত করতে পারে।

1.3 সংস্কৃতির বিকাশ (Growth of Culture)

সংস্কৃতির বিস্তার নিয়ে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে একথা অকপটে স্বীকার করতে হয় যে, 'বিস্তার' ও 'উন্নতি' শব্দদুটি পরস্পর খুব নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কোন ভূখণ্ডে কোন সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটলে তার বিকাশ (growth) এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি অর্থাৎ development অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি— এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সর্বদা চলছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি ও জলবায়ু হ'ল প্রাকৃতিক উপাদান, নিয়োজিত শ্রম হ'ল মানসিক উপাদান এবং বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হ'ল সাংস্কৃতিক উপাদান। আদিম মানুষের সংস্কৃতির উপাদান ছিল নূন্যতম। সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলাফল হিসাবে মানুষের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। জীবজগতের মধ্যে মানুষের প্রাধান্যের কারণই হ'ল তার অন্তঃস্থ ধীশক্তি, মননশক্তি— যা তাকে সংস্কৃতি সম্পর্কে করতে সাহায্য করেছে। মানুষ প্রকৃতিরই অংশ অথচ এই সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বলীয়ান হয়ে সে প্রকৃতিকে নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছে, পরিবর্তন করছে এবং নিজশক্তিকে বাস্তবে রূপদান করে প্রকৃতিপটে পরিবর্তনও আনছে।

সুবৃহৎ হিমবাহগুলির পশ্চাদাপসরণ প্যালিওলিথিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির বিবর্তন শুরু হয়। সংগ্রহকারী তথা পশুশিকার বৃত্তি থেকে মানবগোষ্ঠী ক্রমশঃ সংস্কৃতির সোপান বেয়ে কৃষিকাজ এবং পশুপালনকে আয়ত্ত করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত এই সংস্কৃতি তথা অর্থনীতিই তাকে নগরায়ন এবং শিল্পায়নের পথেও অগ্রসর করে। একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে একই সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত গতিকে প্রবাহিত হয়নি, তবুও একথা বলা যায় যে, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা এবং মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির বিকেন্দ্রীকরণ (divergence) খুব স্পষ্ট ভাবেই পরিলক্ষিত হয়েছিল।

সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতির (Cultural Growth and development) কথা আরো সহজভাবে বিবৃত করা যায়। আদিম মানুষ যখন চাষের কাজ শেখেনি তখন পর্যন্ত অন্যান্য প্রাণী থেকে তার পার্থক্য খুব কমই ছিল। ক্রমশঃ মানুষ বনের বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে নিজের কাজে নিযুক্ত করতে শিখলো। এইভাবেই মানুষ বনের সীমাহীন

বনরাজিকে একটা নিয়মের মধ্যে এনে তাকে নিয়মমাফিক উৎপাদনের কাজে লাগাতে শিখলো। একের আমরা domestication of plant kingdom বলতে পারি। এইভাবেই ব্যাপক অর্থে শুরু হ'ল কৃষিকাজ এবং সংস্কৃতির বিস্তার ক্রমশঃ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর স্তরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিস্তার লাভ করতে শুরু করল। মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে কৃষিকাজ শেখার ঘটনাটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বলে তাকে "কৃষি বিপ্লব" বা 'নবপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব (agricultural on neolithic revolution) বলা হয়। কৃষিকাজ শেখার আগে পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। জঙ্গল বনান্তরে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত খাদ্য নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হ'ত। বাসগৃহগুলিও ছিল অস্থায়ী। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপকরণের সংখ্যা ছিল কম। চাষাবাদ শেখার পর এই সংগ্রাহক তথা পশুপালন যাযাবর গোষ্ঠী ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং স্থায়ী জনবসতি বা permanent settlement-এর অস্তিত্ব সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়।

স্থায়ীভাবে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। পরিবেশ যদি অনুকূল হয়, তাহলে সেই জায়গাতে আরো উন্নত করবার প্রয়াস মানবগোষ্ঠীর চিন্তাকে আপ্লুত করে। পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয়, তাহলেও তার থেকে পরিত্রাণ পেতে তাকে আরো চিন্তাশীল হতে হয়। আভ্যন্তরীণ তাগিদ তাকে নানা জিনিস শেখাতে শুরু করে এবং সংস্কৃতির সূত্রপাত সেই বিন্দুতেই আবার নতুনভাবে জন্ম নেয়। এইভাবে যুগ যুগ ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রহণ-বর্জন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যায় ভরপুর— যা তাকে সাংস্কৃতিক উন্নতির মধ্যে দিয়ে পেতে হয়েছে।

1.4 সাংস্কৃতিক বিকেন্দ্রীকরণ (Divergence of Culture)

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক অপসারণ (Cultural divergence) একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়বস্তু। ভৌগোলিকরা সাম্প্রতিককালে এই বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানবসমাজের কোন এক অংশে কোন এক সাংস্কৃতির উদ্ভব ঘটলেও তার বিকাশ এবং ব্যাপ্তি এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। পশুপালন যাযাবর গোষ্ঠী থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং কৃষিকার্যে নিযুক্তিকরণের ঘটনা পৃথিবীর একটিমাত্র জায়গাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঠিক সেইভাবেই, শিল্পের ক্ষেত্রে—তার বিকাশ এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অপসরণ এক অনবদ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ।

হিমযুগের অবসান প্রাকৃতিক পরিবেশের জগতে নতুন এক বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি করে যেখানে মানুষ তার অভিযোজন ক্ষমতার মাধ্যমে নিজেকে মানিয়ে নেয়। জলবায়ু এবং আবহাওয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে শুরু করে এবং বৃক্ষরাজির অধিক্য ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। ইউরোপের তুন্দ্রা এবং উত্তর চীনের উন্মুক্ত প্রান্তরগুলি ক্রমেই বনভূমির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। মধ্য প্রাচ্যে, যেখানে উদ্ভিদচর্চা এবং প্রাণীদের পোষমানানো (domestication) অনেক পরে শুরু হয়েছিল, সেখানে সাভানা তৃণভূমি মরু অঞ্চলের উষরতাকে অনেকাংশেই প্রচ্ছন্ন করে। এই অভিনবত্ব অবশ্যই সংস্কৃতির অপসারণ বা Cultural divergence-এর পরিচয় বহন করে। হিমযুগের সমাপ্তি এবং জলবায়ুতে পরিবর্তন ক্রমশঃ পৃথিবীকে জনসংখ্যাবহুল করে তোলে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস আরো খাদ্যের সন্ধানে নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতির দিকে মনোনিবেশ করে। সংগ্রহধর্মী উপজীবিকা ক্রমশঃ কমে আসতে তাকে এবং নির্দ্দিষ্ট এলাকায় জনসংখ্যার ধারণ ক্ষমতাকে সহায়তা করবার জন্য কারিগরী এবং কলাকৌশলের বিচ্ছুরণ বা divergence অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা এবং তাকে গ্রহণ করবার জন্য এক নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মানুষ আরো উন্নত সংস্কৃতি এবং কৃষি-সম্পন্ন তথা প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রসর সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ দেখানো বাধ্য হয়। মধ্য প্রস্তুর—যুগে ইউপোর মহাদেশটি সংস্কৃতির জগতে এক পরিবর্তনের প্রমাণ

রাখলো যখন মহাদেশে সংগ্রহধর্ণী উপজীবিকা উৎপাদনমুখী উপজীবিকার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ দেখাতে শুরু করলো। প্রকৃতপ্রস্তাবে, পৃথিবীর নানান প্রান্তে, প্রস্তরযুগের যে বিভিন্ন সময়কাল সম্পর্কে আমরা অবহিত হই, তা ক্রমশই সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের (যন্ত্রপাতি, কর্মধারা, সামাজিক পরিবর্তন) মধ্যে দিয়ে এক নতুন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে উঠতে থাকে। সংস্কৃতির বিকেন্দ্রীকরণ (divergence), যা সদাচঞ্চল এবং গতিময়—তা হয়ত এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

1.5 প্রযুক্তির উন্নতি ও বিস্তার (Development and Spread of Technology)

'উন্নতি' বা development বলতে কোন স্থানের দেশের সম্পদের ব্যবহার যদি পূর্ণমাত্রায় সংঘটিত হয় এবং ঐ অঞ্চল যদি সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনক্ষম অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়—তবেই সেই স্থানকে অর্থনীতিগতভাবে উন্নত (developed) বলা যেতে পারে। আরো সহজভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে বলা যায় যে যদি কোন অঞ্চলের দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে উন্নত পরিলক্ষিত হয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি যদি ত্বরান্বিত হয় এবং ফলাফল হিসাবে যদি ঐ স্থানে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে তবে সেখানে উন্নতি (development) বা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে বলে মন্তব্য করা যেতে পারে। Development বা উন্নতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল যে এতে উন্নত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান তার আয়ের ক্ষমতা, ভোগের সক্ষমতা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের যথোপযুক্ত মানোন্নয়ের প্রতিও অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

'প্রযুক্তির উন্নতি' কোন গোষ্ঠী বা জাতিকে অথবা কোন দেশকে অধিকতর অগ্রবর্তী পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়। সংস্কৃতির একটা বড় দিক হ'ল প্রযুক্তি বা technology। বর্তমানে যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ মানুষের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে রেখেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানবসভ্যতা প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনও তাকে প্রযুক্তিবিদ্যায় আরো পারদর্শী করতে সাহায্য করেছে। আক্ষরিক অর্থে "প্রযুক্তি" বলতে আমরা বুঝি যে কোন সংস্কৃতিবান অথবা কৃষ্টিবান জাতি বা গোষ্ঠীর কাছে ন্যূনতম প্রয়োজন এবং স্বাচ্ছন্দ্য আহরণের জন্য যে যন্ত্রাংশ এবং পদ্ধতির প্রয়োজন হয়—তাই হ'ল প্রযুক্তি। সংস্কৃতির সূতিকাগার (Cultural hearth) বলতে আমরা যা বুঝি, সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তির উদ্ভাবনকেন্দ্র, নব নব ধারণার পীঠস্থান তথা প্রযুক্তিকেন্দ্র যা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত এবং বিস্তৃত হয়েছে। কোন কিছুর উদ্ভাবন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র, কারণ উদ্ভাবন হলেই হল না—দেশ বা স্থানের সংস্কৃতি যত তৎপর এবং সচেতন হবে, ততই প্রয়োজনের তাগিদে এবং সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে নতুন নতুন উদ্ভাবনীর প্রতি তারা আকৃষ্ট হবে। বিশেষ কোন স্থানের উদ্ভাবিত বস্তু বা সামগ্রী পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এইভাবে প্রযুক্তির বিস্তারের সাথে সাথে শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদির ব্যাপ্তি বা পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে। আধুনিক পৃথিবীতে ব্যাপক হারে প্রযুক্তির বিনিময় হলেও সমস্ত দেশ বা রাষ্ট্র পৃথিবীব্যাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগুলিকে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারেনি এবং সেক্ষেত্রেই "প্রযুক্তির ব্যবধান" (technological gap) থেকে গেছে। সেই সঙ্গে আরেকটি দিকও আমাদের মেনে নিতে হবে যে সমস্ত প্রযুক্তিরই সমানভাবে বিস্তার ঘটানো সম্ভব। নয়। কম্পিউটার প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রযুক্তিগুলি উন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলির ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটানো সম্ভব। এভিন্ন অন্যান্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন জীবনবিজ্ঞান, বস্তু-উদ্ভাবন (material innovation) ও শক্তি (energy)—এইগুলির বিস্তারের জন্য বিত্তসম্পন্ন অর্থনৈতিক বনিয়াদযুক্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এমনকি যেখানে প্রযুক্তির বিস্তার স্থানগত দিক থেকে সুবিধাজনক, কিন্তু আমদানীকৃত প্রযুক্তি ঐ বিশেষ দেশ বা রাষ্ট্রে উপযুক্ত বাজার না পাওয়ায় (ক্রয় ক্ষমতা দুর্বল) তার যথোপযুক্ত বিস্তার ঘটানো থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে

খুব স্বষ্টভাবেই বলা যায় যে, প্রযুক্তির বিস্তার যথোপযুক্তভাবে সর্বদিক বজায় রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনী বা বিত্তশালী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেই পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে।

সাংস্কৃতিক ভৌগোলিকদের মতে, আধুনিক প্রযুক্তি পৃথিবীকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছে—যন্ত্রোন্নত কেন্দ্র ও অনুন্নত প্রান্ত। পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত হয়ে পৃথিবীর শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশ্চাত্যের মডেলে আধুনিক প্রযুক্তিতে নিজেদের গড়ে তোলা। শুধু তাই নয়, প্রান্তবর্তী বা অনুন্নত দেশগুলি চাইছে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিকে আমদানি করতে। তাই এইসব ক্ষেত্রে একটা বৈষম্য থেকে যাচ্ছে।

1.6 সাংস্কৃতিক প্রণালীর সমকেন্দ্রিকতা ও ব্যাপন (Convergence and Diffusion of Culture)

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি এক বিন্দু থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়াকে সাংস্কৃতিক ব্যাপক বা সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি বলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে ও কালক্রম অনুসারে স্থান ও সময়ের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সঞ্চারিত হ'লে তাকে ব্যাপন বা পরিব্যাপ্তি বলে। 'সংস্কৃতির ব্যাপন বা পরিব্যাপ্তির মুখ্য প্রবক্তা হলেন টেইলর। ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি উদ্ভাবন বা নতুনের প্রবর্তন বা কখনো কখনো একটি প্রাচীন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবনকারী সমাজ থেকে অন্য সমাজগুলিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ মূলতঃ ভূ-পৃষ্ঠের এক অংশ থেকে অন্যত্র বিচরণের মাধ্যমে সংস্কৃতির ব্যাপন ঘটিয়েছে। এভাবে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সংস্কৃতির রূপ প্রত্যক্ষভাবে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই সংস্কৃতির স্থানান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে আঞ্চলিক পৃথকীকরণ (regional differentiation), অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। নতুন নতুন সংস্কৃতি পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে মিলিত হয়েছে। সুতরাং, এ কথা খুব স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, একদিকে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতির অপসারণ ঘটে এবং অন্যদিকে এই একই প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক সমকেন্দ্রিকতা ঘটায়। আধুনিক তথ্য সম্প্রচার ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন সংস্কৃতিকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

প্রথমদিকে সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটিয়েছে। আদিম অবস্থা থেকে বিভিন্ন উদ্ভাবনের মাধ্যমে তারা প্রত্যেকে নিজের মত করে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। অন্য দিকে সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ্‌রা এই বিবর্তনবাদী বক্তব্য মানেন না। তাঁরা মনে করেন পৃথিবীর যে কোন বিন্দুতের হোক না কেন বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য জনগোষ্ঠী অনুসরণ করতে থাকে এবং সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ছয় থেকে দুই শতাব্দীর মধ্যে ভূপৃষ্ঠে আটটি স্বতন্ত্র অংশে কৃষিজাত ফসলের উদ্বৃত্তের উপর ভিত্তি করে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এগুলি হ'ল মিশরের নীলনদের সভ্যতা, চীনের হোয়াংহো সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি। এই বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতার কিভাবে উদ্ভব হ'ল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এক গোষ্ঠী মনে করেন প্রতিটি অঞ্চলে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আর একদল মনে করেন যে প্রথমে একটি অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে উঠে, পরে সেখান থেকে অন্যান্য অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে।

কোন সংস্কৃতির এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য অথবা নতুন কিছু প্রবর্তন (innovation) হলে তা সব সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা লাভ করে। সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি বা ব্যাপনকে মোটামুটিভাবে দুই প্রকারের বলে বিভাজন করা যেতে পারে। (ক) সচেতন বা পরিকল্পিত পরিব্যাপ্তি, (খ) অবচেতন বা অপরিকল্পিত

পরিব্যাপ্তি। মিশনারীরা তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটালে বিভিন্ন মানুষ সচেতনভাবেই তা গ্রহণ করেন। এটি পরিকল্পিত পরিব্যাপ্তির উদাহরণ। পক্ষান্তরে, গল্পের বই পড়ে পাঠক অথবা চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি দেখে দর্শক যে রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গী, অভিরুচী ইত্যাদি গ্রহণ করে বা তার পৃষ্ঠোপোষকতা করে, তাকে অবচেতন বা অপরিকল্পিত পরিব্যাপ্তি বলা হয়।

সাংস্কৃতিক প্রণালীর ব্যাপন ঘটে তিনভাবে ঃ (১) আবিষ্কারের অভিযানের মাধ্যমে (exploration), (২) প্রচরণ বা migration-এর মাধ্যমে, (৩) আঞ্চলিক বিজয় বা regional conquest-এর মাধ্যমে।

১) আবিষ্কারের অভিযান ঃ আবিষ্কারমূলক অভিযান শুরু হয়েছে বহুদিন আগে থেকেই। অভিযাত্রীরা নতুন কিছু খোঁজবার আনন্দে অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। অনেক সময় বিশেষ উদ্দেশ্যেও অভিযান পরিকল্পিতভাবে সাধিত হয়। অভিযান যে ধরণেরই হোক না কেন, এর ফলে পরিবেশ সচেতনতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অভিযানের ফলে পৃথিবীর এক অংশের মানুষের সঙ্গে অপর এক অংশের মানুষের মেলবন্ধন রচিত হয়। অভিযানের মাধ্যমে লব্ধ নতুন জ্ঞান মানুষের সামনে তার বর্তমান পরিস্থিতিতে বদলানোর জন্য আরও অনেক সুযোগ এনে দেয়।

২) প্রচরণ ঃ এক বিশেষ কর্মক্ষেত্র থেকে অন্য কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরণকে প্রচরণ বলে। এই স্থানান্তরণ ঋতুগত, বাৎসরিক অথবা পর্যায়গত (periodic) হতে পারে। ঋতু ভিত্তিক প্রচরণ বা transhumance বহুল প্রচলিত এক ব্যবস্থা যা শীতপ্রধান অঞ্চলগুলিতে— যেখানে পাহাড়ের ঢালে আধিবাসীরা বসবাস করে, সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখে আমরা শ্রম ট্রান্সহিউম্যান্স বা Labour transhumance এর কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে ঋতুবিশেষে শ্রমিক-ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে দলে দলে শ্রমিক কাজের সন্ধানে চলে আসে শ্রম-উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলি থেকে। কলকাতাতেও এই ধরণের সমাগম নজরে আসে। সন্নিহিত জেলাগুলিতে যখন চাষবাসের কাজ থাকে না, তখন উদ্বৃত্ত শ্রমিক শহরে ভিড় করে কিছু উপার্জনের জন্য। আবার শস্যকাটার সময়ে তারা গ্রামে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফেরৎ চলে যায়।

প্রচরণ নানা ধরনের হাতে পারে এবং প্রতিটি প্রচরণের (migration) ক্ষেত্রে ব্যাপন বা পরিব্যাপ্তির সন্ধান মেলে। প্রচরণের বিভিন্ন বিভাজনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

১) বাস্তুতান্ত্রিক প্রচরণ : এই ধরনের প্রচরণে খাদ্যের সন্ধানে মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাধ্যতামূলকভাবে যেতে হত। তবে এই বাধ্যতামূলক ব্যাপার সুদূর অতীতের ঘটনা বলেই বিবেচিত, কারণ আধুনিককালে বাস্তুতান্ত্রিক প্রচরণে উদ্ভাবনী ছোঁয়া লেগেছে।

২) সামাজিক বাধ্যতামূলক প্রচরণ : সমাজচ্যুত বা দেশচ্যুত হয়ে যখন মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে বাধ্য হয়—তখন কালক্রমে একস্থানের মানুষের সঙ্গে নতুন জায়গার মানুষের ধ্যানধারণার মধ্যে আদানপ্রদান ঘটে। একেই সামাজিক বাধ্যতামূলক প্রচরণ বলা হয়।

৩) স্বচ্ছন্দ প্রচরণ : এই ধরণের প্রচরণে মানুষ তার ইচ্ছামত যেখানে খুশী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তা বাস্তবায়িত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ থেকে দলে দলে মানুষ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচরণ ঘটায়। ফলাফলস্বরূপ এক উন্নত সংস্কৃতি আমেরিকায় সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটায়।

৪) দলবদ্ধ প্রচরণ : একবার প্রচরণ শুরু হলে তা যদি চলতেই থাকে— যতক্ষণ না পর্যন্ত জনসংখ্যা সম্পূর্ণ শেষ হচ্ছে, এই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকে দলবদ্ধ প্রচরণ বলে। এই ধরণের প্রচরণের ফলে নতুন জায়গায় এসে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ জীবনধারায় বসতি গড়ে উঠতে পারে, অথবা নগরায়ণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার নতুন ধরণ খুঁজে পাবার জন্য উদ্ভাবনী পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে। বর্তমানে এক দেশ থেকে দেশান্তরে প্রচরণের উপর সরকারি বিধিনিষেধ য়তই বাড়ছে, দলবদ্ধ প্রচরণ ততই কঠিন হয়ে উঠছে।

যে কারণেই প্রচরণ ক্রিয়া সংঘটিত হোক না কেন—মানুষের স্থানান্তরের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই ধরণের উপনিবেশ গড়ে ওঠার মাধ্যমেই এক একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতি পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং সমকেন্দ্রিকতা দেখা দেয়।

৩) আঞ্চলিক বিজয় ঃ যুদ্ধের শেষে যখন অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী গোষ্ঠী, দুর্বল অপর একটি গোষ্ঠীকে পরাজিত করে, তখন তাকে আঞ্চলিক বিজয় বলা হয়। যুদ্ধে জয়ের জন্য প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নতমানের সমরাস্ত্রের ব্যবহার এবং রাজনৈতিক সংগঠন এ ধরণের বিজয়ের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আঞ্চলিক বিজয়ের ফলে শুধুমাত্র পরাজিত গোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত তা নয় যে শক্তিধর গোষ্ঠী নতুন ভূখণ্ড অধিকার করল, তার সংস্কৃতিও বহুলাংশে বদলে যায়।

সাংস্কৃতিক ব্যাপন (Cultural diffusion) **ও তার সমকেন্দ্রিকতা** (Convergence) উভয়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এই দুই প্রক্রিয়ার মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর একস্থানের সংস্কৃতি অন্যের সংস্পর্শে এসেছে। ফলাফলস্বরূপ বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান সম্ভবপর হয়ে নতুন এক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক উল্লেখ্য যে সাংস্কৃতিক ব্যাপন সংঘটিত হলেই অপর একস্থানে তার সমকেন্দ্রিকতা (Convergence) ঘটবে।

1.7 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

A. প্রতিটি প্রশ্নের মান 10

1) বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের মতামতের নিরিখে 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করুন।
2) "সংস্কৃতি অখণ্ড এবং উপযুক্ত সংস্কৃতি অনুকরণযোগ্য"—নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
3) সংস্কৃতির পরিবর্তনের বা রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অপসরণের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
4) সাংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিস্তারলাভ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করুন।
5) সাংস্কৃতিক প্রণালীর ব্যাপন ও সমকেন্দ্রিকতা কিভাবে সম্পূর্ণযুক্ত তা ব্যাখ্যা করুন।

B. প্রতিটি প্রশ্নের মান 4

1) সংস্কৃতির উৎস কি?
2) সংস্কৃতি কিভাবে বিস্তারলাভ করে ?
3) কোনো দেশের শিল্পায়নে অপসরণের ভূমিকা কি?
4) সাংস্কৃতিক প্রণালীর ব্যাপন কি কি ভাবে ঘটে ?
5) 'সচেতন' বা 'পরিকল্পিত' এবং 'অবচেতন' বা 'অপরিকল্পিত' ব্যাপনের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করুন।

C. প্রতিটি প্রশ্নের মান 2

1) "উন্নতি" বলতি কি বোঝেন ?
2) "প্রযুক্তি" কি?
3) সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তি বা ব্যাপন কিভাবে সংগঠিত হয়?
4) "প্রচরণ কি?
5) 'আঞ্চলিক বিজয়' সাংস্কৃতিক প্রণালীর ব্যাপনে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

একক 2 ❒ বিশ্বে পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির নমুনা (Changing Cultural Pattern of the World)

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা (Introduction)

2.1.1 উদ্ভাবন (Innovation)

2.1.2 প্রসারণ বা ব্যাপন (Diffusion)

2.1.3 সমন্বয় সাধন (Integration)

2.1.4 আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবন (Assimilation)

2.1.5 সংস্কৃতায়ন (Acculturation)

2.2 উপসংহার (Conclusion)

2.3 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

2.1 প্রস্তাবনা (Introduction)

সংস্কৃতি গতিশীল। সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল এর পরিবর্তন বা রূপান্তর। সময়ের বা কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সত্তাকে বজায় রেখে পরিবেশের অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয় বা একটা মেলবন্দন রচনা করে। এই পরিবর্তনের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন আরেকটি সংস্কৃতি বা Culture-এর উদ্ভবও হতে পারে। প্রত্যেক সংস্কৃতিই অবিরত ধারায় পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন বা রূপান্তর সব সময়েই যে অত্যন্ত দ্রুত সংগঠিত হচ্ছে তা নয়। পরিবর্তন ক্ষেত্রবিশেষে দ্রুত, কখনো বা বিলম্বিত। এ প্রসঙ্গে একথাও সত্য যে এই রূপান্তরের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন হারে সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহ আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ অনুসরণ করতেন যা বর্তমান থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন প্রকৃতির।

সংস্কৃতির উপাদানগুলির পরিবর্তন প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কৃতির পরিবর্তনের পরিচায়ক। এই উপাদানগুলিকে প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ উপাদান ও বাহ্যিক উপাদানে ভাগ করতে পারা যায়। কোনো একটি সংস্কৃতির অস্তিত্বগত, প্রযুক্তিগত ও অর্থনীতিগত পরিবর্তনকে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হিসাবে ধরা যেতে পারে। নব্য প্রস্তরযুগীয় বিপ্লব, অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব, সাম্প্রতিককালের বিশ্বায়ন—সবই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের অর্ন্তভূক্ত।

ক্রমপরিবর্তনশীল পোষাক-পরিচ্ছদ (fashion), রাজনৈতিক অস্থিরতা বিভিন্ন আন্দোলন, ধর্ম প্রচার প্রভৃতি বাহ্যিক পরিবর্তনেরই পরিচায়ক। সংস্কৃতির বাহ্যিক পরিবর্তনের উপাদানগুলি প্রধানতঃ সামাজিক পুর্ণগঠন অথবা বিশেষ পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাগ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দুইদেশের সংস্কৃতির পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে।

সাংস্কৃতিক ভূগোলের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল 'পরিবর্তন'। পৃথিবীর কোন অঞ্চলের কোন সংস্কৃতিই চিরস্থায়ী নয় এবং তা কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তুসামগ্রী, সাংগাঠনিক প্রণালী অথবা আদর্শবাদের স্থায়ীত্বের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে কোনো কোনো সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য হয়ত দীর্ঘস্থায়ী—তবে তা অবশ্যই পরিবর্তনশীল। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে কোনো দেশ বা অঞ্চলের সংস্কৃতি যদিও স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্বতা নিয়ে গড়ে ওঠে, তবুও তা সদাসর্বদাই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনকে সেই দেশ বা সমাজ অধিকাংশক্ষেত্রেই স্বাগত জানায়। সংস্কৃতির এই পরিবর্তন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং বৃহৎ। সংগ্রহধর্মী অর্থনীতি থেকে স্থায়ীভাবে কৃষিকার্যে পরিবর্তিত হবার যে পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক মানসিকতা আমরা সুদূঢ় অতীত থেকে লক্ষ্য করেছি, তা কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সমাজ ও তার সংস্কৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণুকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরো বলতে হয় যে, শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং একই সঙ্গে যে নগরায়ণের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছিল তা কিন্তু সংস্কৃতি ও সমাজ দুটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ জাগিয়েছিল।

মানুষের এই সংস্কৃতির পরিবর্তন কোন সুনির্দ্দিষ্ট পথে অথবা খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হয়নি। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, কোন কোন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর অতি দ্রুত সংগঠিত হয়। আবার কোন কোন সংস্কৃতির রূপান্তর বহু শতকের অতিক্রমণেও সাধিত হয় না। তবে আবার একথা স্বীকার্য যে সমস্ত সংস্কৃতিই কিন্তু গতিশীল। নতুন প্রলক্ষণ, আচার, প্রথা ইত্যাদির উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের ধারায় সংস্কৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নতুন প্রবর্তিত ধারার সাথে পুরাতন বিভিন্ন ধারা সংশোধিত হয় বা বিলুপ্ত হয় যা 'পরিবর্তিত সংস্কৃতি' (changed culture) নামে অভিহিত।

কৃষি এবং শিল্প বিপ্লবের ফলে সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল তা কিন্তু সর্বত্রই সমান ব্যাপকতায় ছড়িয়ে পড়েনি। অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন এতটাই সামান্য ছিল যে তা মোটামুটি সকলের অগোচরেই থেকে গিয়েছে। অথচ এই বিপ্লবই আবার অন্য ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট সংস্কৃতির ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তিত সংস্কৃতির কথা বলতে পারা যায়। ১৯৪০ সালে মার্কিন সংস্কৃতি যা ছিল তার চেয়ে বহুগুণ ''পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক রূপ'' ঐ দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন এবং ব্যাপক বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতিন (electronic), পরিবহন এবং প্রযুক্তিগত উপকরণ উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক, ব্যবহারিক, প্রযুক্তিক এবং মনোরঞ্জনের দিক দিয়ে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে—তা ঐ বৃহৎ দেশের সংস্কৃতিকে আমূল পরিবর্তিত করেছে। চাকুরী এবং রুজি-রোজগারের পথ এই ব্যাপক পরিবর্তনে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে এবং সমাজের নারীর স্বাধীনতা, চাকুরীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা, বিভিন্ন ভূমিকায় সসম্মানে অবতীর্ণ হওয়া—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি সাংস্কৃতিক প্রবাহের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

উদ্ভাবন বা নব-প্রবর্তন কোনো সংস্কৃতির অভ্যন্তরে ঘটতে পারে অথবা অন্য সংস্কৃতির উদ্ভাবিত প্রলক্ষণ কোন বাহকের মাধ্যমে নতুন সংস্কৃতিতে প্রবর্তিত হতে পারে। এছাড়া, অন্য কোন সমতুল্য সংস্কৃতি থেকে আসা কোন প্রলক্ষণ ধীরে ধীরে নতুন সমাজে বা সংস্কৃতিতে গৃহীত হবার পর সংস্কৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে ও নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বা রূপান্তর কতকগুলি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সেগুলি হলঃ— (১) উদ্ভাবন, (২) প্রসারণ বা ব্যাপন (৩) সমন্বয় সাধন, (৪) আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবন, (৫) সাংস্কৃতায়ন।

2.1.1 উদ্ভাবন (Innovation)

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল উদ্ভাবন বা Innovation। উদ্ভাবন বলতে কোন অজানা বা অজ্ঞাত জিনিসকে খুঁজে বের করাকে বোঝায়। এছাড়া উদ্ভাবন বলতে নতুন কিছু আবিষ্কারকেও বোঝায়। 'উদ্ভাবন' শব্দটি বলার সাথে সাথে যে জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুরণিত হয় তা হ'ল কোন নতুন যন্ত্র বা নতুন কৌশল পদ্ধতির আবিষ্কার। তবে নৃতত্ত্ব এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে উদ্ভাবন শব্দটির বিস্তার এবং পরিধি আরও ব্যাপক এবং সুবিন্যস্ত।

সংস্কৃতির অবিরত পরিবর্তনের ফলে সমাজ যে নবরূপ লাভ করে তার প্রথম প্রক্রিয়া হ'ল 'উদ্ভাবন'। এই ধরণের 'উদ্ভাবনগত প্রক্রিয়া সমাজের কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা কোন নির্দিষ্ট সদস্যের মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন সুদূঢ় অতীতে গাছের বাকল বা পশুর চামড়া পরিধান সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হত। বর্তমানে সুতো থেকে কাপড় তৈরি এবং তা থেকে পোষাক তৈরি সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে বলে অবশ্যই মনে করা যেতে পারে। সুতো তৈরির উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং পোষাক নির্মিতকরণ—নিঃসন্দেহে বস্ত্র-সংস্কৃতির জগতে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করলো। শুধু এক্ষেত্রে নয়, মানবজীবনের জীবনযাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই উদ্ভাবনীর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই কারণেই পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ এবং তার সংস্কৃতি।

উদ্ভাবন সৃষ্টিশীল বলে এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং বিস্তৃতি ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় অধিকাংশ সংস্কৃতি অপর কোন সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত বিষয়ের সম্প্রসারণের ফলেই রূপান্তরিত হয়েছে। উদ্ভাবন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন ঃ—

(১) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন (Organizational innovation) ঃ বৈবাহিক সম্বন্ধ, রাজকীয় সম্বন্ধ, প্রতিনিধিমূলক সরকার, লিখিত গঠনতন্ত্র, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনের উদাহরণ। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিকভাবে সুদৃঢ়তা লাভ করে।

(২) বুদ্ধিগত উদ্ভাবন (Intellectual innovation) ঃ সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কোন দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বুদ্ধিগত উদ্ভাবনের মধ্যে পড়ে—যা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন এনেছে।

(৩) অস্তিত্বগত উদ্ভাবন (Existent innovation) ঃ কোন কিছুর অস্তিত্ব আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, অথচ তা ছিল অনুন্মোচিত। এই ধরণের উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অস্তিত্বগত উদ্ভাবনের প্রসঙ্গ এসে যায়। উদাহরণ হিসাবে মেরু দেশ আবিষ্কার, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার প্রভৃতি অস্তিত্বগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে।

2.1.2 প্রসারণ বা ব্যাপন (Diffusion)

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি এক বিন্দু থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়াকে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি, প্রসারণ বা ব্যাপন বলে। সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায় বা অবস্থা হ'লো প্রসারণ বা ব্যাপন বা পরিব্যাপ্তি। পৃথিবীব্যাপী সংস্কৃতিগতভাবে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে—ব্যাপন বা প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমেই তার ব্যাপক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়।

সংস্কৃতির ব্যাপন সম্পর্কে সর্বপ্রথম মতবাদ প্রকাশ করেন প্রখ্যাত নৃ-তত্ত্ববিদ্ টেইলর। পরবর্তীকালে ক্রিটি স্মীথ, পেরিও উইলজার এই মতবাদের সমর্থন করেন। তাঁদের মতে সংস্কৃতির বাহ্যিক পরিবর্তনই ব্যাপন। এটিই হল সংস্কৃতির

রূপান্তর বা বাহ্যিক পরিবর্তনের অন্যতম দিক। মূলতঃ এই মতবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে মূলতঃ পাঁচটি প্রধান অবস্থান বা পরিবেশ ব্যাপনে বা প্রসারণে সাহায্য করে। এগুলি যথাক্রমে হ'ল ঃ—

(১) ব্যক্তিগত যোগাযোগ (personal contact)

(২) ধর্মপ্রচারে তৎপরতা (missionary activity)

(৩) দেশ বিজয় (conquest)

(৪) বাণিজ্য (trade) এবং

(৫) গণসংযোগ মাধ্যম (mass-media)

সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপরিল্লিখিত সবকটি অবস্থান বা পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে তার মধ্যে ধর্মপ্রচারে তৎপরতা, দেশ বিজয়, বাণিজ্য, গণসংযোগ-মাধ্যম ইত্যাদির প্রভাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মপ্রচারকগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তারা নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা বা বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের ধর্মপ্রচারের এলাকায় প্রবর্তন করেন। এভাবে পৃথিবীর বহু জায়গাতেই তাঁরা সংস্কৃতির ব্যাপনের অন্যতম শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন।

অতীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দেশবিজয় ইত্যাদি ছিল বহু পরিচিত ঘটনা। দেশজয়ের ফলে বিজয়ী দেশ বিজিত দেশের উপর নিজস্ব সংস্কৃতিকে বলপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে বিজিত দেশের সংস্কৃতিতে নতুন ও ভিন্ন সংস্কৃতির গুণাগুণসমূহ পরিব্যাপ্তি লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ ভারতে প্রায় দু'শো বছরের ইংরেজ শাসন ঐ দেশের সংস্কৃতির বহু সুদূরপ্রসারী ভাবধারাকে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

আধুনিক পৃথিবীতে সংস্কৃতির ব্যাপন ও প্রসারণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যকে (trade) অন্যতম বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্ভাবিত ও প্রচলিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই ভিন্ন সংস্কৃতিতে উপস্থাপিত ও প্রবর্তিত হচ্ছে।

'গণসংযোগ মাধ্যম' সংস্কৃতির প্রসারণ ও পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে দূরত্ব অকল্পনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এখন কোন স্বাধীন সংস্কৃতিসম্পন্ন অঞ্চলই বিচ্ছিন্ন নয়। গণসংযোগ মাধ্যমের প্রচারকার্যই বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রসারণে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদি অনেক প্রাচীন মাধ্যম হলেও ব্যাপক গণসংযোগ মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত। সাম্প্রতিককালে অবশ্য কম্পিউটার এবং ফ্যাক্স, ই-মেল, ইন্টারনেট প্রযুক্তি ইত্যাদি সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তনে এবং প্রসারণে যুগান্তরকারী ভূমিকা পালন করেছে।

2.1.3 সমন্বয় সাধন (Integration)

সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনের মধ্য দিয়েও কোন বিশেষ অঞ্চলের বা স্থানের সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে পর্যটন শিল্পের উন্নতির ফলে সভ্য জগতের মানুষ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষজনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় ব্যবস্থার আওতায় আসে এবং ফলাফলস্বরূপ সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে এক সমন্বয় সাধিত হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমেও সংস্কৃতির মিশ্রণ সম্ভব। দিগ্বিজয়ী আলেকডাণ্ডার পাকিস্তানে উপস্থিত হ'লে ভারতীয়

সংস্কৃতি ও গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে এক মেলবন্ধন রচিত হয়েছিল। সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি রূপান্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া মানবসমাজকে সদাপরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। যদিও একথা স্বীকার্য যে কোন রূপান্তর বা পরিবর্তন পরিবেশ বা সমাজকে এক অস্তিত্বকর অবস্থার মুখোমুখি ফেলে দেয়, তবুও সংস্কৃতির নিজস্বতা এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সদা পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতির পরিবর্তনের আবশ্যকীয়তাকে অগ্রাহ্যও করা যায় না।

2.1.4 আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবন (Assimilation)

আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবনের মাধ্যমেও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে। কোন এলাকার অধিবাসীদের সংস্কৃতি এবং বিজেতা বা ধর্ম প্রচারকদের সংস্কৃতি যখন কিছুকাল পাশাপাশি বিদ্যমান থাকে, তখন অধিবাসীদের সংস্কৃতি প্রবল এবং বিজেতাদের সংস্কৃতি দুর্বল ও অনুন্নত থাকে। এরপর অবস্থায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল সংস্কৃত উন্নত ও প্রভাব বিস্তারকারী সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াই হল সাংস্কৃতিক অঙ্গীভবন বা আত্তীকরণ প্রক্রিয়া।

আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবনের মাধ্যমে সমাজবদ্ধজীব মানুষ অপর এক মানবগোষ্ঠী থেকে পাওয়া নতুন ভাবধারা, আচার-আচরণ এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ ও তার বিকাশসাধন করতে চায়। এমনকি, নতুন এবং ভিন্ন সংস্কৃতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে একটি দুর্বল গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত সবল গোষ্ঠীর নিয়ম, আচার-বিচার, জীবনধারা, মূল্যবোধ ইত্যাদি গ্রহণ করে সেই দলের সঙ্গে সম্পূণভাবে মিশে যাচ্ছে। এইভাবে নিজগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে পরিহার করে অন্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা—এটাই সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবনের আরেক রূপ হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। সংস্কৃতির আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবন—যা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের অন্যতম কারণ হিসাবে নির্ধারিত তা কোন দেশ বা রাষ্ট্রের সীমান্তের ধরণ বা প্রকৃতির দ্বারা ব্যাপক তথা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে সীমান্তের উভয় পার্শ্বের রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ সংগঠিত হচ্ছে। অতীতে ইংরেজ সংস্কৃতি ফরাসী সংস্কৃতি থেকে তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ছিল। ১০৬৬ সাল থেকে শুরু করে তিন শতাব্দীর মধ্যে বৃহৎ নরম্যান ফরাসী সংস্কৃতির উপাদানগুলি এ্যাংলো স্যাক্সন ইংরেজদের সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। ফলে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংরেজ সভ্যতা বহুলাংশে ফরাসী সভ্যতার সমস্তরে পৌঁছায়। স্যাক্সনদের সংস্কৃতি দ্বীপ-অধ্যুষিত এলাকার সংস্কৃতি। ফরাসী সংস্কৃতির তুলনায় তা কিয়দংশ মধ্যমমান যুক্ত। ফরাসী সংস্কৃতি মূল ভূ-খণ্ডের সংস্কৃতি হওয়ায় তুলনামূলকভাবে উন্নত। এই কারণেই খুব সহজেই ফরাসী নরম্যানদের সংস্কৃতি ইংরেজ সংস্কৃতির সাথে অঙ্গীভূত হতে পেরেছিল এবং ফলাফল হিসাবে ইংরেজ সভ্যতায় পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিল।

আবার সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাঞ্চু ও মঙ্গোল জাতি চীনের কাছে পরাজিত হবার পর তাদের সীমিত সংস্কৃতি চীন সংস্কৃতিতে আত্তীকৃত হয়ে পড়ে। এ থেকে বলা যায় সংঘাতের সময় ক্ষুদ্রতর ও দুর্বল সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি বৃহত্তর সংস্কৃতিতে আত্তীকৃত হয়ে পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে নাভাহো উপজাতিরাও নিজেদের সংস্কৃতি একইভাবে অঙ্গীভূত করে বসবাস করছে। নাভাহোরা সম্ভবতঃ ভূট্টাচাষ, কাপড়বোনা, বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক আচার-অপাচার pneblo নামক উপজাতিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। পরবর্তীকালে তারা স্পেনীয়দের কাছ থেকে মেষ পালন এবং রূপোর দ্রবণ পদ্ধতিও গ্রহণ করেছে। এগুলিকে গ্রহণ করে তারা নিজেদের সংস্কৃতিতে উন্নত করেছে এবং নিজেদের মান অনুসারে উন্নতশীল হয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে স্পেনীয় বা আমেরিকানরা আসার ফলে এদের ভূ-সম্পত্তি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে

১৮৪৫ থেকে পরবর্তী সময়ে এদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তারা স্বাধীন, গর্বিত এবং প্রধানতঃ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও তাদের প্রাচীন পন্থাগুলো ধরে রাখতে আগ্রহী।

2.1.5 সংস্কৃতায়ন (Acculturation)

সংস্কৃতির পরিবর্তন বা রূপান্তরের ক্ষেত্রে 'সাংস্কৃতায়নের' ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক বিশ্বে, যেখানে বিশ্বায়নের (globalization) ধারণা মানুষকে সচেতন করেছে, সেখানে সাংস্কৃতায়ন সম্পর্কে আলোচনা তথা পর্যালোচনা শুধু আবশ্যিকই নয়—এই ধারণাও যথেষ্ট প্রাচীন তা স্বীকার করতেই হয়। অন্য একটি সংস্কৃতির প্রভাবে কোন বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যে উভয়ের ক্রমবর্ধমান সাদৃশ্যতার ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকেই সহজ ভাষায় সংস্কৃতায়ন বলা হয়। যুদ্ধ-বিজয় এবং স্বল্পস্থায়ী উপনিবেশ গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যের প্রভাব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা অবক্ষয়, নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং প্রবর্তন, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কোন দেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন এক বর্ণ বা গোষ্ঠীর মানুষ তাদের ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্কৃতি হারাতে পারেন, কারণ সাংস্কৃতায়নের মাধ্যমে যে পরির্বতন সংগঠিত হয়, তাতে অপেক্ষাকৃত সরল এবং বৃহত্তর গোষ্ঠীর প্রাধান্যই সাধারণতঃ বজায় থাকে। তবে অন্যরকমও হতে পারে অর্থাৎ কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী ঐ বৃহত্তর গোষ্ঠী গ্রহণ করে তাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সাংস্কৃতায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতির এই যে পরিবর্তন বা রূপান্তর তা হঠাৎ বা দ্রুততর না হয়ে ক্রমান্বয়িক হয়। 'সংস্কৃতায়ন' অন্যভাবে বলতে গেলে পরিব্যাপ্তি বা ব্যাপনের (diffusion) আরেক রূপ। যখন আমরা বিশেষ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য জটিলতা ও প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য অনুসরণ করি, তখন আমরা এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে তার 'পরিভ্রমণ' লক্ষ্য করি। এই প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে কি ঘটলো তা পরিব্যাপ্তির বিষয়, আর সংস্কৃতিতে কি ঘটলো, তা সংস্কৃতায়নের বিষয়।

কোন দেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কিভাবে সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নতুন এক রূপ পরিগ্রহ করে—তা আমরা জানতে পারি যখন দেখি যে প্রাচীন জাপান কিভাবে সংস্কৃতায়নের মাধ্যমেই সংস্কৃতির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য চীন থেকে গ্রহণ করল। প্রায় সহস্রাধিক বছর আগে এই সাংস্কৃতায়ন সম্পূর্ণ হয়। এর গতি ছিল কেবল, পূর্বমুখী—অর্থাৎ চীন থেকে জাপানে। বর্ণমালা লেখবার পদ্ধতি, ধাতব মুদ্রা, লৌহশিল্প, মুদ্রণ শিল্প, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি অনেক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য চীনদেশ থেকে জাপান গ্রহণ করে। অপরপক্ষে চীন গ্রহণ করে জাপানী পাখা। জাপান চীনদেশ থেকে তার বহুবিধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গ্রহণ করলেও জাপানের কিছু প্রাচীন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু অক্ষুণ্ণ এবং অটুট ছিল। যেমন, জাপান কিছু কুফুসিয়ানাবাদ গ্রহণ করেনি। মঙ্গোলীয় আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে জাপান অভিজাত পুরোহিত তন্ত্রকেই অধিক শ্রেয় বলে মনে করে। উনিশ শতকে জাপানে আবার একবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দূর প্রাচ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকদের আবির্ভাবের ফলে জাপানে পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জাপানীরা পশ্চিমী সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য যন্ত্র ও কারিগরী শিল্প জাপানে সাদরে গৃহীত হয়। ভারী শিল্পসহ সব রকম আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্রুত উন্নতি লাভ করে। জাপানের মত আফ্রিকাতেও কোনো কোনো জায়গায় সংস্কৃতায়ন বা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সব অঞ্চলে বৃটিশ সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে দেশীয় সংস্কৃতিগুলির বিলোপ সাধনের মাধ্যমে নিজের স্থান সুদৃঢ় করে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশপ্রেমিক, রাজনৈতিক, সমাজসেবী, লোক-হিতৈষী ও শিক্ষিত গোষ্ঠী

'আমেরিকাকরণ' আন্দোলনে মেতে ওঠেন। এর ফলে মেরু দেশীয়, ইটালীয় ও বিদেশ থেকে আগত অন্যান্য লোকদের দেশীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে যেতে হয়েছিল। 'বিদেশী' নামে অভিহিত বাইরে বসবাসকারীদের বাইরেই থেকে যেতে হ'ল, যারা ভিতরে ছিলেন তাদেরকে যত দ্রুত ও ফলপ্রসূভাবে সম্ভব এ্যাংলো-স্যাকসন আমেরিকানদের জীবনধারার সঙ্গে নতুনভাবে গঠিত হতে হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের ও ইউরোপীয় সভ্যতার সমন্বয় সাধনের সাথে যুক্ত কিছু পরিমাণে ঐ ধরণের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

2.2 উপসংহার (Conclusion)

সংস্কৃতির পরিবর্তন বা রূপান্তর নিয়ে আলোচনা শেষে এ কথা খুব স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের পাশাপাশি ভারত উপমহাদেশে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সমাজে তার প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে নানা সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের বহু পত্রপত্রিকা এবং প্রকাশনায় তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন। বিশ্বব্যাপী নিত্য নতুন উদ্ভাবন এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতীয় সমাজে তার যা প্রভাব সেগুলি মূলতঃ বাণিজ্য ও অর্থনীতি, বাজার অর্থনীতি, যোগাযোগ ও গণমাধ্যম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রব্রজন এবং আন্তঃ-সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্যে মূলতঃ খুঁজে পাওয়া যায়। সামাজিক পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন হ'ল সাম্প্রতিককালের ঘটে যাওয়া এক ঐতিহাসিক পদ্ধতি যা সমাজকে সাধারণতঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে এবং সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তির সমাজব্যবস্থার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষের সনাতনী সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার আমূল রূপান্তর শুরু হয়ে গেছে। মানুষের চিন্তাধারায়, দৈনন্দিন জীবযাপনে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারে, নব নব চিন্তাভাবনায় পণ্যের উদ্ভাবন এবং তাদের ব্যবহার ও বাজারমুখী করবার প্রবণতা বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তুতন্ত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। পরিবর্তনের এই ঢেউ নিকটবর্তী সন্নিহিত অঞ্চলগুলি থেকে শুরু করে আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত মানুষের অন্তরে অনুরণন জাগিয়েছে। সংস্কৃতির এই পরিবর্তনে অনেক জায়গায় নতুন কোন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে তা মূলতঃ শহর কেন্দ্রিক স্থানগুলিতেই প্রকটভাবে খুঁজে পাওয়া গেছে। ফলাফলস্বরূপ কোন কোন জায়গায় ঐতিহ্যশালী সনাতনী ভারতীয় সংস্কৃতির জায়গায় জনপ্রিয় ও সস্তার সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ভারতীয় শহর এবং নগর উভয়ই এই ধরণের সংস্কৃতির স্থল হিসাবে বর্তমানে চিহ্নিত হয়েছে।

2.3 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

A. প্রতিটি প্রশ্নের মান 10

1) 'সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল এর পরিবর্তন বা রূপান্তর'—উল্লিখিত বাক্যাংশের যথার্থ বিশ্লেষণ করুন।
2) সংস্কৃতির পরিবর্তন বা রূপান্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
3) ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কি ধরণের সাংস্কৃতিক রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়েছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।
4) কৃষি এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
5) উদ্ভাবনের মাধ্যমে কিভাবে সংস্কৃতির ব্যাপন সম্ভব হয়—তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

B. প্রতিটি প্রশ্নের মান 4

1) উদ্ভাবনের বিভিন্ন প্রকারগুলি বিবৃত করুন।
2) প্রসারণ বা ব্যাপনে সাহায্যকারী পাঁচটি পরিবেশ বর্ণনা করুন।
3) সংস্কৃতির সমন্বয়সাধন কিভাবে সংগঠিত হয়?
4) আত্তীকরণ বা অঙ্গীভবন প্রক্রিয়ায় কিভাবে সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়?
5) বিশ্বায়ন সংস্কৃতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলেছে কি? যুক্তিসহ লিখুন।

C. প্রতিটি প্রশ্নের মান 2

1) 'সাংস্কৃতায়ন' কি?
2) 'অঙ্গীভবন' বা 'আত্তীকরণ' কি?
3) 'সংস্কৃতির সূচিকাগার' বলতে কি বোঝেন?
4) সংস্কৃতির প্রসারণে বাণিজ্যের (trade) প্রভাব কি?
5) পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে 'সংস্কৃতির রূপান্তর' সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

একক 3 ❐ স্থান বা পরিসরের ধারণা : নিরপেক্ষ এবং আপেক্ষিক স্থান (Concept of Space : Absolute and Relative Space)

গঠন

3.1 ধারণা **(Concept)**

3.2 স্থানের গুরুত্ব **(Importance of Space)**

3.3 নিরপেক্ষ এবং আপেক্ষিক স্থান **(Absolute and Relative Space)**

3.3.1 নিরপেক্ষ দেশ বা স্থান **(Absolute Space)**

3.3.2 আপেক্ষিক দেশ বা স্থান **(Relative Space)**

3.3.2.1 সমাজীয় দেশ বা স্থান **(Social Space)**

3.3.2.2 অর্থনৈতিক দেশ বা স্থান **(Economic Space)**

3.3.2.3 অন্যান্য আপেক্ষিক দেশ **(Other Relative Space)**

3.4 প্রশ্নাবলী **(Questionnaire)**

3.1 স্থান বা পরিসরের ধারণা (Concept of Space)

ব্যাপক অর্থে স্থান বা পরিসর (Space) বলতে পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর কোন স্থানের বিস্তারকেই বোঝানো হয়। ''স্থান'' এই শব্দ থেকেই ''স্থানিক'' (Spatial) শব্দটির উৎপত্তি। ভূগোলশাস্ত্রে 'স্থানিক' শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ভৌগোলিকের মতে ভূগোলশাস্ত্রে, স্থান ও স্থানিক সম্পর্ক (Space and Spatial Relations)—এই বিষয়েরই এক নিজস্বতা এবং স্বকীয়তা এনে দেয়। তাই বিভিন্ন পরিমণ্ডল থেকে আহৃত ভৌগোলিক জ্ঞান সব সময়েই বিশেষীকৃতভাবে দেশ অথবা স্থানের (Space) সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ স্থান বা পরিসরের (Space) ধারণা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের মতে, স্থান বা দেশ হলো বস্তুসামগ্রীর অস্তিত্বের একটি যথাযোগ্য পরিবেশ) Space is the logical condition for the existence of things)। নিউটনের মতে 'স্থান' হ'ল একটি বস্তুমুখী বাস্তব বিষয়। বার্কলে 'স্থান' বা Space সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে এটা হ'ল একটি মানসিক গঠন উদ্ভূত ধারণা যা মূলতঃ দৃশ্য এবং শব্দের মূর্ছনার সাহচর্যে গঠিত (Space is a mental construct based on the co-ordination of sight and sound)। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'স্থান সম্পর্কে ধারণার উদ্ভব সেইখানেই, যেখানে জড়বস্তুর বিশ্লেষণ মূলতঃ সংঘটিত হয় আমাদের পর্যবেক্ষণ বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে' (all concepts of space were derived from the sense experience dealing with material bodies)।

বহুযুগ আগে থেকেই বিদগ্ধ গুণীজনেরা ভূগোলকে 'কোরোলজি' (Chorology) বা 'ক্ষেত্রবহুত্ববিজ্ঞান'—এই আখ্যান দিয়ে আসছেন। তাঁদের মূল কাজ ছিল পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য যথা ভূ-প্রকৃতি, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, মানুষ এবং তার পরিবেশ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোজন ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া। এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীতে, ভৌগোলিক দেশ ও বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানগুলির বণ্টনের যথাযথ কারণ নির্ণয় ও

সমীক্ষার উপর বিশেষ আলোকপাত করা হত না। তার বদলে স্থানিক পৃথকীকরণ (areal differentiation) উপরই গুরুত্ব বেশি দেওয়া হত। ভ্যারেনিয়াসের সংজ্ঞায় আমরা প্রাচীন ভূগোলশাস্ত্র চর্চ্চার এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাই— " Geography is that part of mixed mathematics which explains the state of the earth and of its parts, depending on quantity, viz. its figures, place, magnitude and motion, with the celestical appearence' '। গ্রীক পণ্ডিত ভ্যারেনিয়াসের ঐতিহ্য অনুসরণ করে মার্কিনী ভৌগোলিক রিচার্ড হার্টশোর্ন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভূগোলশাস্ত্রকে ক্ষেত্রবহুত্ববিজ্ঞান বা Chorology হিসাবে গুরুত্ব দেওয়াই শ্রেয়। তিনি বলেন যে ক্ষেত্রবহুত্ববিজ্ঞান ও আঞ্চলিক ভূগোল মূলতঃ একই বিষয়। এই বিষয়টি পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে। হার্টশোর্ণের ভাষায় বলতে গেলে " Geography is a discipline that seeks to describe and interpret the variable character of the earth's surface as the world of man.' '। তিনি আরো বলছেন যে, যদিও ভূগোলশাস্ত্রে সময়ের গুরুত্ব যথেষ্ট, তবুও প্রাথমিক বিচারে ভূগোলশাস্ত্রের মূলগত দায়িত্ব হ'ল ভূপৃষ্ঠের উপর প্রাপ্ত বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানসমূহের বর্ণনা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা। হার্টশোর্ণের মতে অবস্থান তত্ত্ব (locational theory) ভূগোলের নিজস্ব বিষয় নয়। এটি অনেকাংশে অর্থনীতিভিত্তিক এবং এই অবস্থান তত্ত্ব জানতে হলে ভূগোলের তুলনায় অর্থনীতির প্রশিক্ষণ বেশি দরকার হয় (more training in economics is needed than geography)।

১৯৪০-এর শেষে এবং ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে ভূগোলের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে স্থান সম্পর্কিত আলোচনা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। হার্টশোর্ণের পর স্কীফার (Schaefar) স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, ভূ-পৃষ্ঠে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের স্থানিক বণ্টন সংক্রান্ত সূত্র গড়ে তোলে এমন বিজ্ঞান হিসাবে ভূগোলকে কল্পনা করতে হবে এবং ভূগোলের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'স্থান' যা অন্য কোন বিজ্ঞান আলোচনা করে না (জ্যোতির্ময় সেন, ২০০৪)। স্কীফার হার্টশোর্ণের মতকে ব্যতিক্রমবাদ (exceptionalism) বলে চিহ্নিত করেছেন। স্কীফারের ধারণা অনুযায়ী ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল দেশ বা স্থান (space) যা অন্য কোনো বিজ্ঞান তো আলোচনা করেই না, উপর স্থান বা স্থানিক সম্পর্ক অথবা দেশ বা দৈশিক সম্পর্ক (spatial relation) ভূগোলশাস্ত্রের একেবারে নিজস্ব বিষয়। স্কীফার আরো বলেছেন যে ভৌগোলিকদের উচিত অঞ্চল সমীক্ষা ছেড়ে স্থানিক বিজ্ঞানী হিসাবে নিজেদের তুলে ধরা। স্কীফারের ধারণা অনুযায়ী " Geography has to be conceived as the science concerned with the formulation of the laws govering the spatial distribution of certain features on the surface of the earth.' '। এভিন্ন স্থান বা দেশ সম্পর্কে স্কীফার আরো কিছু মৌলিক ধারণা আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে, স্থানিক সম্পর্কগুলির (spatial relationship) ধরণ এবং গতিপ্রকৃতি অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হবে এবং সেক্ষেত্রে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি এবং যুক্তি চিহ্নিত থাকবে। কিন্তু হার্টশোর্ণের মতে, যদিও অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ধারণা, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্দ্দিষ্ট নীতি পৃথিবীর সমগ্র অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবুও এক একটি অঞ্চল তাদের নিজস্ব স্বকীয়তায় প্রাণবন্ত থাকে। হার্টশোর্ণের মতে ভূগোলের স্থানিক ধারণার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্যই হবে মূল ধারণার ভিত্তি স্বরূপ। স্কীফার এবং হার্টশোর্ণের স্থান বা দেশ সম্পর্কে মতামত, দৃষ্টিভঙ্গী বা বিতর্কের ফলাফলস্বরূপ একথা বলা যায় যে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভূগোলকে বিজ্ঞানের আলোয় দেখবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়গুলির মত ভূগোলকে জানতে বা বুঝতে গেলে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত—এই সত্য ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল। ফলাফলস্বরূপ, অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের মত ক্ষেত্র সমীক্ষার (field study) ক্ষেত্রে নিয়ম এবং তত্ত্বের প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা গুরুত্ব পেতে শুরু করল। স্কীফারের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভূগোলের সংজ্ঞা যা দাঁড়ালো তা হ'ল ঃ— 'ভূপৃষ্ঠে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের দৈশিক বণ্টন সংক্রান্ত সূত্র গড়ে তোলে এমন বিজ্ঞান হিসাবে ভূগোলকে দেখাত হবে। (Geography has to be conceived as the science con-

cerned with the formulation of the laws governing the spatial distribution of certain features on the surface of the earth.)। এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে স্কীফারের মতে ভূগোল একটি দৈশিক বিজ্ঞান (spatial science), যার মূল বিষয়বস্তু হল দেশ। এই মতামত প্রায় সর্বাংশেই যুক্তিনির্ভর, অর্থাৎ কতকগুলি প্রাথমিক অনুমানের ভিত্তিতেই প্রকল্প গড়ে তারপর প্রকৃত ক্ষেত্রে তার পরীক্ষা সুনির্দ্দিষ্ট করা। এই ধরণের ভাবনাকে আবার 'নিয়মস্থাপনকারী' (nomothetic) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্কীফারের বক্তব্য ভূগোল চিন্তাধারার জগতে এক প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। যুক্তিনির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জগতে এক প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। যুক্তিনির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোতে আলোকিত স্কীফারের ভূগোলশাস্ত্র বিষয়ে এই অভিমত পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে মাত্রিক বিপ্লব বা Quantitative Revolution-এর চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করে।

স্কীফারের পর অ্যাকারম্যান (Ackerman, 1965) ভূগোল সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, ''ভূগোল হ'ল ভূপৃষ্ঠে দৈশিক বণ্টন ও দৈশিক সম্পর্কের সমীক্ষা'' (the study of spatial distribution and space relations on the earth's surface)। ভূগোলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্কীফারের বক্তব্য অনুসরণ করে একথা যথেষ্ট স্পষ্ট যে ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু হিসাবে দেশকে (space) তিনি নিঃসংকোচে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে টাফে (Taffe, 1970) একইভাবে দৈশিক সংগঠনের উপর জোর দিয়েছেন (Geography is the study of saptial organization expressed as patterns and processes)। অপরদিকে ইয়েটস্ (Yeates, 1968) বিজ্ঞান হিসাবে ভূগোলের এই তত্ত্ব বিশেষতঃ দৈশিক তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠা করবার দিকটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে 'ভূপৃষ্ঠের নানা বৈশিষ্ট্যের দৈশিক বণ্টনের ব্যাখ্যা করে এবং অগ্রিম বার্তা বহন করে এমন তত্ত্ব যুক্তিসঙ্গতভাবে গড়ে তোলা ও মিলিয়ে নেওয়ার কাজে সংযুক্ত বিজ্ঞান হিসাবে ভূগোলশাস্ত্রকে ধরা যেতে পারে (Geography can be regarded as a science, concerned with the national development, and testing of theories that explain and predict the spatial distribution and location of various characteristics, on the surface of the Earth)।

3.2 স্থানের গুরুত্ব (Importance of space)

স্থান বা space নিয়ে এ পর্যন্ত ভূগোল বিষয়ে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে এ কথা স্পষ্টই বলা যায় যে, ভূগোল হ'ল অনেকাংশেই স্থানিক বিজ্ঞান (spatial science); মূলতঃ দুটি কারণে 'স্থান' এই বিষয়টির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণও।

প্রথমতঃ মানবগোষ্ঠীর যে কোন কর্মকাণ্ড কোন 'দেশ' বা 'স্থানেই' সংগঠিত হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে এই সত্যটি ভূগোলশাস্ত্রে চরমসত্য বলে বিবেচিত হয়েছে। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে মেরুদেশীয় প্রান্তরের প্রত্যন্তর বিন্দু পর্যন্ত যে সব অঞ্চলে মানুষের গমনাগমন নির্ধারিত হয়েছে, সেই সমস্ত অঞ্চলের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডই ভূ-পৃষ্ঠের নির্ধারিত 'স্থানের' উপরে সুসম্পাদিত হচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে ভৌগোলিকগণ তাঁদের অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে স্থান সম্পর্কে সচেতন আছেন। সর্বোপরি বিষয়টি শেষ পর্যন্ত 'মানচিত্র সম্বন্ধীয়' হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, স্থান মানুষের ক্রিয়াকলাপের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে স্থানিক পরিবেশ হ'ল মোট পরিবেশের চতুর্থ উপাদান (প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্থানিক) অর্থাৎ যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করে এবং বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদন করে। বর্তমানে সমাজের স্থানিক গঠনের আলোচনা এবং এই গঠনের

প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ নিয়ে বহুবিধ আলোচনা হচ্ছে এবং ক্রমশঃ সেগুলি গুরুত্ব লাভও করছে। অনেক ভৌগোলিক স্থানিক বিশ্লেষণকে (spatial analysis) ভৌগোলিক অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গুরুত্ব দেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে জনবসতি বা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কারণ বা উপাদান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্থানিক গুরুত্ব বা তার বিশ্লেষণ এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

3.3 নিরপেক্ষ এবং আপেক্ষিক স্থান (Absolute and Relative Space)

১৯৫০ দশকের শুরু থেকেই ভূগোল 'দেশ' বা 'স্থান' সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নানা বিতর্ক, আলোচনা এবং সমালোচনা শুরু হয়েছে। ভূগোল প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যতিক্রমবাদী কিনা, অঞ্চল সমীক্ষাতে দূরে সরিয়ে রেখে ভূগোলশাস্ত্রকে দৈশিক বা স্থানিক বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কিনা—এ বিষয়ে বিতর্কের পরিসমাপ্তি আজও শেষ হয়নি। 'দেশ' অথবা 'স্থানের' ধারণা যথেষ্ট জটিল। ভূগোলকে এককথায় 'দৈশিক বিজ্ঞান' হিসাবে আখ্যা দেওয়া বা সেই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করা খুব সহজ কথা নয়। তবে বহু আলোচনা শেষে ভৌগোলিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'দেশ' বা স্থানের ধারণা দু'ধরণের হতে পারে, যথা—নিরপেক্ষ দেশ বা স্থান (absolute space), আপেক্ষিক দেশ বা স্থান (relative space)।

3.3.1 নিরপেক্ষ দেশ বা স্থান (Absolute Space)

এই ধারণা অনুসারে দেশ হ'ল স্পষ্ট, প্রাকৃতিক ও বাস্তব এক বিষয় বা এক অস্তিত্বশীল বস্তু যাকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে ধারণা করা যায়। ভূগোলশাস্ত্রের ধ্যানধারণা অনুযায়ী 'দেশ' বা 'স্থানকে' এইভাবেই দেখা হয়েছে। নিরপেক্ষ দেশ যেন এক আধার (container of things), যার মধ্যে পার্থিব সব বিষয় (গ্রাম, শহর, নগর, রাস্তা, বসতবাড়ী, কারখানা, চাষের ক্ষেত, নদী, জলাশয়, জঙ্গল ইত্যাদি) রয়েছে। দেশ সম্পর্কে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভৌগোলিকগণ দেশকে অসংখ্য ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে পারেন। এই এক একটি ছোট ভাগ বা খণ্ডকে এলাকা (area) বলা চলে, যদিও এই বিভক্তিকরণের সঠিক কোন ভিত্তি নেই। মোটামুটিভাবে এই বিভাজন এলোমেলোভাবেই (arbitrarily) করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কোন নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি (standard) অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠকে ভাগ করা হয়, তখন ঐ এক একটি দৈশিক খণ্ডকে অঞ্চল (region) বলা যেতে পারে। এইভাবে কোন দেশ বা স্থানকে বহুসংখ্যক ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা ও তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের কথা মনে রেখে 'দেশকে' এভাবে নিরপেক্ষ স্থান হিসাবে বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য। হার্টশোর্ণের স্থানিক ধারণা এই ধরনের নিরপেক্ষ স্থানের কল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। হার্টশোর্ণের এই ধারণাকে এক ধরনের ভাবলেখী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন বলা যেতে পারে—যেখানে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট। হার্টশোর্ণের মতামতের সুতীব্র বিরোধিতা করেছেন স্কীফার। স্কীফার যে দেশ বা স্থানের কথা ভেবেছেন তাও কিন্তু এই নিরপেক্ষ দেশই। কিন্তু তাঁর অভিমত অনুযায়ী ভৌগোলিক সমীক্ষায় অঞ্চল বিভাগ ও বর্ণনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলে চলবে না, প্রকৃত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে দেশের বা স্থানের জ্যামিতিক গুণাগুণের উপর। স্কীফারের এই ধারণাটি কান্টের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্কীফার মনে করতেন কোন দেশে বা স্থানে মানুষের কর্মপদ্ধতির অভিব্যক্তি ঘটে ঐ দেশ বা স্থানের নানান ধরণের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে এবং এর থেকে অবস্থান তত্ত্ব (Locational theory) গড়ে তোলা যায় সমাজে কি ধরণের প্রক্রিয়া কাজ করছে তা না জেনেও শুধু দেশের উপরে বিন্যাস সমীক্ষা করে সেই সংক্রান্ত তত্ত্ব গড়ে তোলাই ভূগোলের কাজ। এই প্রসঙ্গে ক্রিস্টলারের কেন্দ্রীয়স্থান

তত্ত্বের (central place theory) উল্লেখ করা যেতে পারে। হার্ভের (Harvay, 1973) ভাষায়, নিরপেক্ষ দেশ নিজেই একটি বস্তু, অর্থাৎ দেশ হল সুস্পষ্ট, অভিজ্ঞতালব্ধ এক বিষয় যার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় এবং সাথে সাথে পরিমাপও করা যায়। বাস্তবিকভাবে দেশ নিয়ে সমীক্ষা করবার সময় স্মরণে রাখা দরকার যে এই দেশ সমাজেরই অংশ এবং তা সমাজের আধারিত।

3.3.2 আপেক্ষিক দেশ বা স্থান (Relative Space)

ভৌগোলিকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন 'দেশ' বিভিন্ন ধরণের ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ দেশ সম্পূর্ণভাবে কাল ও প্রক্রিয়ার (process) সঙ্গে যুক্ত। আপেক্ষিক ধারণায় স্থান বা দেশ বস্তুর আধার নয়, বস্তুর আরোপিত গুণ (attribute); মানবগোষ্ঠীর কাছে সেই সব স্থান বা দেশেরই অর্থ আছে যা মানুষ নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্টি করে। জীবিকার্জন (livelihood pattern), বিশ্রাম, উপভোগ (leisure), বৃত্তি (occupation), গার্হস্থ্যযাপন ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং তা অর্থবহ হয়ে ওঠে। এই 'স্থান' বা 'দেশ' কেবল নিরপেক্ষভাবে বিচারের বিষয় নয়। স্থানের গুরুত্ব নির্ভর করে যখন মানুষ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানকে কি দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করে তার উপর; সেই দেশ বা স্থান নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনা কি, তাকে মানবগোষ্ঠী কিভাবে ব্যবহার করে—ইত্যাদি নানা ধরণের বিষয়ের উপর। সুতরাং দেশ শুধু নিরপেক্ষভাবে বিচার্য নয়। দেশের তাৎপর্য নির্ধারিত হয় মানুষ তাকে কিভাবে গ্রহণ করেছে— তার উপর। অবশেষে দেখা যাচ্ছে যে আপেক্ষিক দেশ হল সামাজিক দেশ (social space)। সামাজিক দেশ বা স্থান সম্পর্কে জানতে হলে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি (processes) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। দেশকে শুধু নিরপেক্ষ ধারণায় দেখলে ভূগোলশাস্ত্র আস্তে আস্তে স্থানিক বা দৈশিক জ্যামিতি সমীক্ষার (spatial geometry) দিকে সরে যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে হয়তো ভৌগোলিক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা এভাবে কিছুটা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু দেশের জ্যামিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা (explanation of human behaviour) পাওয়া কঠিন। ফলাফলস্বরূপ, ইদানীংকালে ভূগোলে দেশ বা স্থানের আপেক্ষিক ধারণা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

আপেক্ষিক দেশ নানা ধরণের হতে পারে। যেমন সমাজীয়, অর্থনৈতিক, অবধারণমূলক বা কর্মধারার দেশ।

3.3.2.1 সমাজীয় দেশ বা স্থান (Social Space)

এমিলি ডার্কহাম (Emile Durkheim) ১৮৯০-এর দশকে স্পষ্টভাবেই সামাজিক দেশ বা স্থান সম্পর্কে ধারণাটি ব্যক্ত করেন। ভৌগোলিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় স্থান, দেশ (space) শব্দগুলির একে অপরের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও সমাজবিজ্ঞানে স্থান কথাটির একটি অন্য মাত্রা আছে। সমাজবিজ্ঞানের এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারণা গ্রহণ করে না, সেখানে সামাজিক কর্মধারাই স্থানের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করে। এক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কিন্তু যেভাবে সেইগুলি কোন স্থানে উল্লেখযোগ্যভাবে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে, সমাজভূগোলে তাই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রকাশ পায়।

অধ্যাপক চ্যাপম্যানের (G. P. Chapman, 1977) অভিমত অনুযায়ী আপেক্ষিক দেশই (relative space) ভূগোলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। মানুষ সমাজ তথা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। প্রতিটি মানুষেরই একটি করে একান্ত নিজস্ব বা ব্যক্তিগত দেশ বা পরিসর (personal space) আছে। এই ব্যক্তিগত দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়। এই অংশে মানুষ তার আত্মবিশ্বাস, স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে যাবতীয় কার্যধারা সম্পাদন করে। তাছাড়া, স্থান, কাল এবং

পরিস্থিতির তারতম্যে এই সমাজীয় দেশের আকার ও আয়তন বাড়তেও পারে অথবা কমতেও পারে। ব্যক্তির সামাজিক স্থিতি অনুসারে এই ব্যক্তিগত দেশের আয়তন কম-বেশী হতে পারে। একটি গ্রাম বা শহরে যতগুলি মানুষ আছে, ততগুলিই ব্যক্তিগত দেশ আছে এবং প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত দেশ প্রত্যেকের থেকে আলাদা। তবে একথা বলা যায় যে একই পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত দেশের মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঠিক সেইভাবে কোনো কৃষিপ্রধান গ্রামে প্রতিটি কৃষকেরই একটি ব্যক্তিগত দেশ থাকে এবং গ্রামের সকল কৃষক যখন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে যৌথভাবে গ্রামের কোন এলাকাকে ব্যবহার করেন, তখনই সমাজীয় দেশের বা social space-এর ধারণা পূর্ণ মাত্রা পায়। এইভাবে শহরাঞ্চলেও এক একটি পাড়ায় এক এক ধরণের জীবিকা, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং জীবিকা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক দেশ গড়ে উঠতে পারে। একথা স্মরণযোগ্য যে, সমাজীয় দেশ তৈরি হয় নিরপেক্ষ দেশ এবং বেদন জগৎ-কে (perceive world) একত্রিত করে। বলা যেতে পারে, সমাজীয় দেশ যেন একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সব সদস্যের ব্যক্তিগত দেশকে নিয়ে তৈরি এক মোজাইক চিত্র। Buttinner (1969)-এর ভাষায় অন্যভাবে বলতে গেলে সমাজীয় দেশ হ'ল ' a protion of an urban residential mosaic occupied by a homogeneous group whose members are identifiable not only by their social-economic and demographic characteristics, but also by their shared values and attitudes leading to common behavior pattern' । প্রতিটি সামাজিক স্থান বা দেশকে একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এবং তা সেখানকার অধিবাসীদের মূল্যবোধ, পছন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রতিফলন হিসাবে কাজ করে। সমাজীয় দেশের মধ্যে অবস্থান করছে অগণিত বিন্দু (যেমন বসতবাড়ী, বিদ্যালয় উন্মুক্ত ক্ষেত্র, দোকানপাট, বাজার, অফিস, ধর্মীয় স্থান, মনোরঞ্জন স্থান ইত্যাদি) এবং রেখা (যেমন রাস্তা, রেলপথ, সড়কপথ ইত্যাদি) যা ঐ বিভিন্ন বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত জায়গাগুলিকে যুক্ত করেছে। একটি জায়গায় যতগুলি সামাজিক গোষ্ঠীর কেন্দ্রীকরণ ঘটে ততগুলি সমাজীয় দেশের সন্ধান ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায়। শহরাঞ্চলে, যেখানে সামাজিক গোষ্ঠীর ঘনবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়, সেখানে সমাজীয় দেশের ঘনত্বও বেশি হয়। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার্য যে একটি গোষ্ঠীর সামাজিক দেশ অন্যটির উপর আংশিকভাবে প্রসারিত হতে পারে।

3.3.2.2 অর্থনৈতিক দেশ বা স্থান (Economic Space)

ভূগোলশাস্ত্রে অর্থনৈতিক দেশ (economic space) শব্দটিও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আলোচনার সুবিধার্থে ধরা গেল তিনটি বিন্দুর (P, Q এবং R) সুনির্দ্দিষ্ট তিনটি অবস্থান আছে। এখানে P বিন্দুর পূর্বদিকে ৩০ কিলোমিটার দূরে Q বিন্দু এবং পশ্চিমদিকে ৪০ কিলোমিটার দূরে R বিন্দু অবস্থিত। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য P থেকে একঘণ্টায় ১৫ টাকা খরচ করে R বিন্দুতে পৌঁছোনো যায়। কিন্তু Q বিন্দুর অবস্থান R বিন্দুর তুলনায় কাছে হওয়া সত্ত্বেও P থেকে ঐ বিন্দুতে পৌঁছাতে দু'ঘণ্টা সময় লাগে এবং ২৫ টাকা খরচ হয়। ফলে প্রকৃত দূরত্বের দিক থেকে P ও Q একে অপরের নিকটে হ'লেও দেখা যাচ্ছে সময় এবং ব্যয়ের হিসাবে P ও R পরস্পরের বেশি কাছে, অর্থাৎ P ও R-এর আপেক্ষিক দূরত্ব কম। দৈশিক দূরত্ব যখন পরিবহন ব্যয়, সময়, রাজনৈতিক অসুবিধা, সামাজিক দূরত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বলে আপেক্ষিক দেশ। যখন তা সময়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তা কালিক দেশ (time space)। ঠিক সেইরকম যখন পরিবহন ব্যয়ের মাধ্যমে প্রকশ করা হয়, তখন তাকে বলে 'অর্থনৈতিক দেশ'। ভৌগোলিক দেশ যেমন নিরপেক্ষ এবং অপরিবর্তনীয় (দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব সাধারণতঃ একই থাকে), অর্থনৈতিক দেশের ক্ষেত্রে ধারণা ঠিক তা নয়। এই ধারণা পরিবর্তনশীল। সময় এবং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে,

সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিবহন ব্যয়ে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলে আপেক্ষিক দেশ কখনো প্রসারিত অথবা সংকুচিত হয়।

3.3.2.3 অন্যান্য আপেক্ষিক দেশ (Other Relative Space)

আরো কয়েক ধরনের আপেক্ষিক দেশ ভৌগোলিকরা চিহ্নিত করেছেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল অবধারণ দেশ বা (cognitive space)। সমাজে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও চলাফেরার মধ্য দিয়ে অবধারণ দেশ গড়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক, অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা থেকে খুলনা ছিল যথেষ্ট কাছে, মুম্বাই ছিল দূরে। দেশ বিভাজনের পরে খুলনা বৈদেশিক রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্থানে পরিণত হল। ফলাফল হিসাবে কলকাতা থেকে খুলনার যোগাযোগ কঠিন হয়ে পড়ল। কিন্তু অন্যদিকে, ভৌগোলিক দূরত্বের বিচারে মুম্বাই কলকাতা থেকে বহুদূরে অবস্থিত হলেও দ্রুতগামী ট্রেন ও বিমান চলাচলের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের কাছে এসে পড়েছে। ভারত এবং বাংলাদেশ— উভয় দেশের মানুষের কাছেই এরকম একটি অবধারণ বা ধারণা হত। এই যে আপেক্ষিক দেশ—অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও ব্যাপকভাবে পরিচিত—এটিই হল অবধারণ দেশ।

এছাড়া একজন ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠী তার দৈনন্দিন জীবনে দেশের যে অংশে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে, তাকে বলে কর্মধারার দেশ (activity space)। এই কর্মধারার দেশ আবার কিছুটা অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মক্ষেত্রের দেশও (territorial space) অনেকটা এই ধরণের।

বাস্তুতান্ত্রিক দেশ (ecological space) বলতে বোঝায় মানুষের পরিবেশের সুবিধা ও বাধাগুলিকে সে কিভাবে দেখছে, কাজে লাগাচ্ছে এবং নিজ নিজ প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সাহায্যে তাকে কিভাবে অতিক্রম করছে।

ডেভিড হার্ভের মতামত অনুযায়ী স্থান হ'ল সাম্বন্ধিক। তাঁর মতে 'দেশ' বা 'স্থান' প্রকৃত পক্ষে বস্তুর মধ্যে আধারিত (Contained in object) অর্থাৎ একটি বস্তুর আস্তিত্বের ভিতর লুকিয়ে থাকে সেই বস্তুর সাথে অন্যান্য বস্তুর সম্পর্ক। হার্ভের দৃষ্টিভঙ্গীতে দৈশিক বা স্থানিক বিশ্লেষণ (spatial analysis) প্রকৃতপ্রস্তাবে সামাজিক বিশ্লেষণ ছাড়া কিছুই নয়। সামাজিক পটভূমিকে বাদ দিয়ে, সামাজিক সম্বন্ধগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছে—তাকেও বাদ দিয়ে, দেশের কোন সম্যক ধারণা বা সমীক্ষা করা সম্ভব নয়। ডেভিড হার্ভের এই চিন্তাধারা কার্ল মার্ক্সের রচনা সমূহের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য মূলক ভৌগোলিকরা (radical geographers) 'দেশ' বা স্থান' সম্পর্কে এই সাম্বন্ধিক ধারণা গ্রহণ করেছেন। পরিশেষে একথা বলা যায় যে ভূগোল শাস্ত্রে 'দেশ' বা 'স্থানের ধারণা বিভিন্নরকম। ভৌগোলিকদের সুচিন্তিত ধারণা, মতামত ও বিশ্লেষণের উপর তা অনেকাংশে নির্ভরশীলও বটে।

3.4 প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

A. প্রতিটি প্রশ্নের মান 10

1) হার্টশোর্ণের সবিশেষ উল্লেখসহ ভূগোলশাস্ত্রে দেশ বা স্থানের (space) দর্শন আলোচনা করুন।
2) ভূগোলে ব্যাপ্তিস্থানের (space) ধারণা ব্যক্ত করুন।
3) ভূগোলপাঠে ব্যাপ্তিস্থান সম্পর্কে ধারণা কি? ভৌগোলিক ও সামাজিক ব্যাপ্তিস্থানের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করুন।

4) নিরপেক্ষ ব্যাপ্তিস্থান ও আপেক্ষিক ব্যাপ্তিস্থানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

5) ভূগোলশাস্ত্রে স্থান বা দেশের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।

B. প্রতিটি প্রশ্নের মান 4

1) অবস্থান ও ব্যাপ্তিস্থানের মধ্যে পার্থক্য কি?

2) 'দেশ' বা 'স্থান' সম্পর্কিত আলোচনায় স্কীফারের অবদান কি?

3) 'ব্যতিক্রমবাদ' বলতে কি বোঝেন? কার মতবাদকে কে 'ব্যতিক্রমবাদ' বলেছেন?

4) ক্ষেত্রবহুত্ব বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

5) ইয়েটস্ ভূগোলশাস্ত্রকে কি দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছেন?

C. প্রতিটি প্রশ্নের মান 2

1) ব্যাপ্তিস্থান কি?

2) রিচার্ড হার্টশোর্ণ কে ছিলেন? তাঁর অবদান কি?

3) সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান কাকে বলে?

4) কবে থেকে ভূগোলশাস্ত্রে 'স্থান'-সম্পর্কিত ধারণা স্বীকৃতি পেতে শুরু করে?

5) কেন্দ্রীয়স্থান তত্ত্বের (Central place theory) মুখ্য প্রবক্তা কে?

পাঠ-সহয়িকা

1. Johnston R. J. et. al. (ed) 1981, The Dictionary of Human Geography, Oxford, Basil Blackwell.
2. Fellmann - Getis - Getis, 7th edition, Human Geography; McGraw Hill.
3. Dikshit R. D; Geographical Thought, 1997, Prentice Hall of India.
4. Singh Yogendra, Culture Change in India, 2000, Rawat Publications.
5. Adhikari Sudeepta, Fundamentals of Geographical Thought, 1995, Chaitanya Publishing House.
6. Todaro Michael P. and Smith Stephen C; Economic Development, eighth edition, Pearson Education.
7. Hayami Yujiro, Development Economics, 2001, Oxford University Press.
8. লাহিড়ী দত্ত, কুন্তলা, ভূগোল চিন্তার বিকাশ, 2004 ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাঃ লিঃ।

9. মতিন মিয়া, এম. এ, সাংস্কৃতিক ও নগর ভূগোল, ২০০৪, পারফেক্ট পাবঃ, ঢাকা।

10. মারুফা কাজী ও কাজী আবুল মাহমুদ, সাংস্কৃতিক ও নগর ভূগোল, ২০০৪, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

11. কাজী আব্দুর রউফ ও কাজী আবুল মাহমুদ, ভৌগোলিক চিন্তা ও ধারণা, বিকাশ, ২০০৩, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

12. সমাজ ভূগোলের রূপরেখা, জ্যোতির্ময় সেন, ২০০৪, কল্যাণী পাবলিশার্স।